২১

ফেব্রুয়ারি

অমর একুশে ৬০ বছর

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২

Martyr's Day and International Mother Language Day 2012

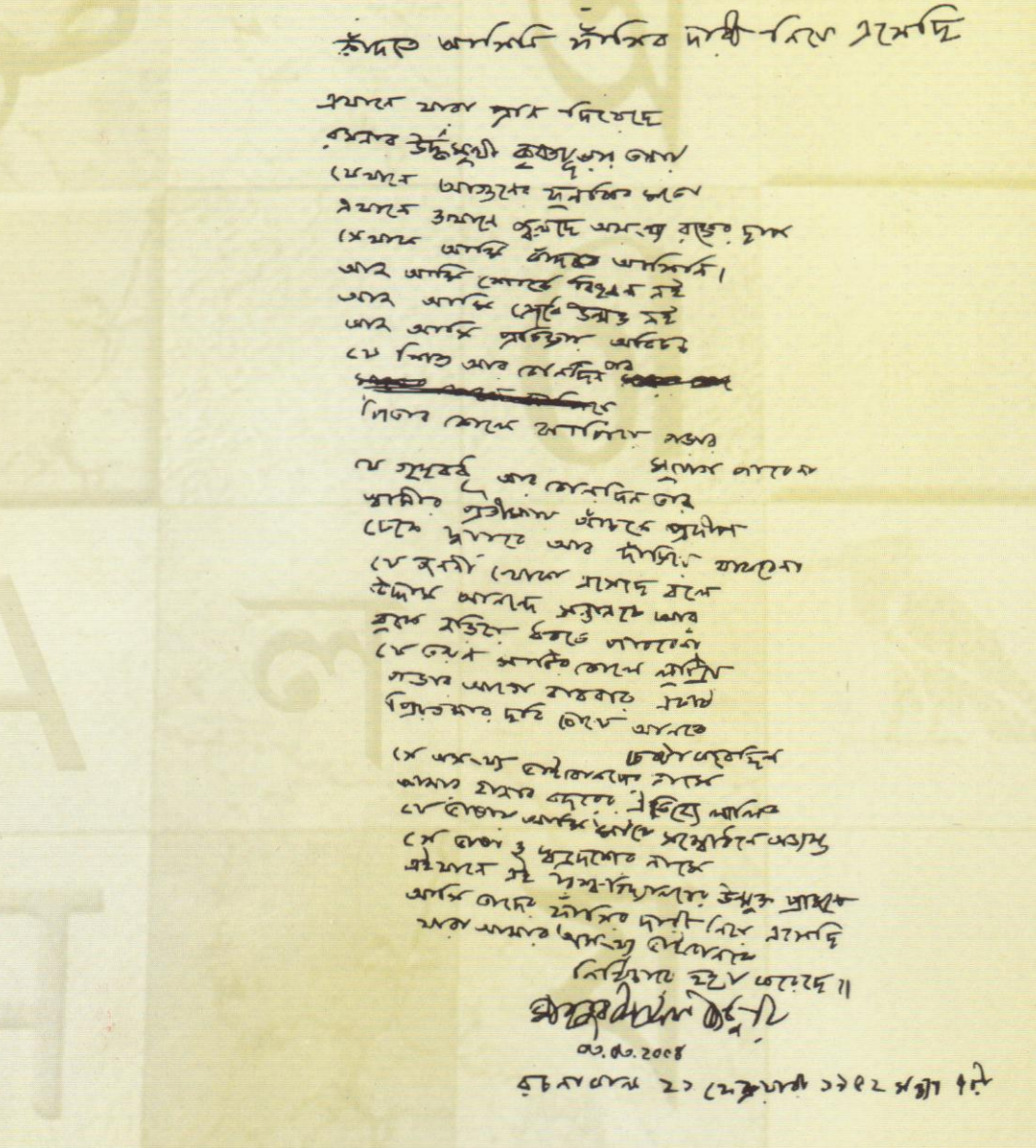

একুশের প্রথম কবিতার অংশবিশেষ : কবির স্বহস্তে লিখিত

ফেব্রুয়ারি ২১

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২

স্মরণিকা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১২।। ৯ ফাল্গুন ১৪১৮

প্রকাশনা
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রচ্ছদ ও নকশা
কাইয়ুম চৌধুরী

স্মরণিকা উপ-কমিটি
আহ্বায়ক
রশীদ হায়দার

সদস্য
অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, বাংলাদেশ
অধ্যাপক মোহীত উল আলম, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, বাংলাদেশ
অধ্যাপক সিদ্দিকা মাহমুদা, চেয়ারপার্সন, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সৌরভ সিকদার, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা, কবি ও প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক, নজরুল ইনস্টিটিউট
জনাব মোবারক হোসেন, প্রধান গ্রন্থাগারিক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলা একাডেমী
ড. অরুণা বিশ্বাস, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

মুদ্রণ
লেজার স্ক্যান লিমিটেড
বিএমএ ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১৫/২ তোপখানা রোড ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৫৬২৮৬৫, ৯৫৬৭৬০৮, মোবাইল : ০১৮১৯২১২৮১৪

আবুল বরকত। শহীদ আবুল বরকতের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানা বাবলা গ্রামে। ১৯২৭ সালের ১৬ জুন তাঁর জন্মদিন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আইএ পাস করে পূর্ববাংলায় চলে আসেন ১৯৪৮ সালে। ওই বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫১ সালে অনার্স পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছিলেন। শহীদ বরকত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে এসেছিলেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানেই তিনি পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হন। অত্যধিক রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়। বহু কষ্ট করে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে, পরে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়।

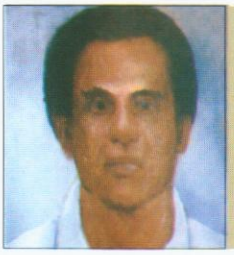

রফিকউদ্দিন আহমদ। শহীদ রফিকের জন্ম ১৯২৬ সালের ৩০ অক্টোবর, মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর থানার পারিল গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আবদুল লতিফ, মা রাফিজা খাতুন। শহীদ রফিক মা-বাবার প্রথম সন্তান। তাঁর পিতার প্রেস ব্যবসার সাথে যুক্ত থাকলেও তিনি মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে বাণিজ্য বিভাগে অধ্যয়ন করতেন। শহীদ রফিকের বিবাহের দিন ধার্য হয় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই। কন্যার নাম পানুবিবি। ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রথমে শোনা যায় তিনজন ছাত্র মারা গেছে। শহীদ রফিকের ভগ্নিপতি মোবারক আলী খানের মাধ্যমে জানা যায় শহীদ রফিকের মাথায় গুলি লেগেছে। গুলির আঘাতে শহীদ রফিকের মগজ বেরিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে বলেও শোনা যায়।

শফিউর রহমান। ১৯১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলায় কোন্নগর গ্রামে শহীদ শফিউর রহমানের জন্ম। ১৯৪৫ সালের ২৮ মে কলকাতার তমিজউদ্দিন আহমদের কন্যা আকিলা খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ। দেশবিভাগের পর পিতা মাহবুবুর রহমান ঢাকা চলে আসেন। পড়াশোনার পাশাপাশি শহীদ শফিউর রহমান ঢাকা হাইকোর্টে কেরানি পদে চাকরিও করতেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি শফিউর রহমান সাইকেলে অফিসে যাওয়ার পথে নবাবপুর রোডে ভাষার দাবিতে আন্দোলনরত মিছিলে পুলিশ গুলি করলে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যালে নিয়ে চিকিৎসা দিলেও শেষপর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়নি। অতিকষ্টে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল বলে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা সম্ভব হয়।

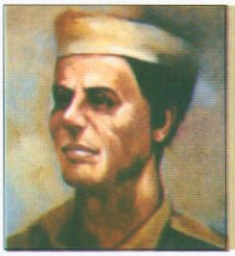

আবদুল জব্বার। শহীদ আবদুল জব্বারের জীবন প্রকৃত অর্থেই বৈচিত্র্যময়। আর্থিক কারণে পঞ্চম শ্রেণির বেশি লেখাপড়া করতে পারেননি, তবে মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া তাঁর স্বভাবে ছিল এবং এভাবেই জন্মভূমি গফরগাঁও ছেড়ে নারায়ণগঞ্জ এসে এক সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি চলে যান বার্মায়। প্রায় বারো বছর বার্মায় কাটানোর পর দেশে ফিরে আসেন; বিয়ে করেন আমেনা খাতুন নামের এক মেয়েকে। শহীদ আবদুল জব্বারের পাকিস্তানের প্রতি ছিল চরম বিতৃষ্ণা। তিনি পাকিস্তানকে 'ফাহিস্তান' বলে উপহাস করতেন। শহীদ জব্বার শাশুড়ির চিকিৎসা করাতে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ভাষা আন্দোলনের সমাবেশে হাজার হাজার বাঙালি অংশ নিলে তিনিও তাতে অংশ নেন। সেই আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালালে যারা শহীদ হন, আবদুল জব্বার তাঁদের অন্যতম।

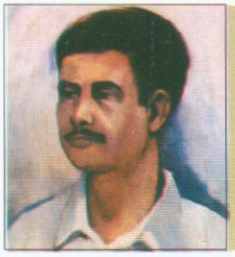

আবদুস সালাম। শহীদ আবদুস সালাম অর্থাভাবে বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেননি। ফেনীর দাগনভুঁইঞা উপজেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামে তাঁর জন্ম, ১৯২৫ সালে। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া। শহীদ আবদুস সালাম দাগনভুঁইঞা কামাল আতাতুর্ক হাই স্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। তারপর চাকরির সন্ধানে ঢাকা এসে সরকারের ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিস বিভাগে পিয়ন পদে চাকরি পান। ঢাকায় তিনি ৩৬/বি নীলক্ষেত ব্যারাকে বাস করতেন। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিতে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলে ছাত্র জনতা সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। শহীদ আবদুস সালাম তাতে অংশ নেন। সেই বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হলে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। তাঁকে বাঁচানো যায়নি। তাঁর লাশ আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়েছিল।

আবদুল আউয়াল। শহীদ আবদুল আউয়াল পেশায় একজন রিকশাচালক। তিনি শহীদ হন ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যখন ছাত্র বিক্ষোভ চলছিল, তখন আবদুল আউয়ালও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বয়স ২৬ বছর। পিতা মোহাম্মদ হাশিম। সে সময় শহীদ আউয়ালের ঢাকার ঠিকানা ছিলো ১৯, হাফিজুল্লাহ রোড। শহীদ আউয়াল সম্পর্কে এর বেশি তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

অহিউল্লাহ। শহীদ অহিউল্লাহ ৮/৯ বছরের একটি বালক। অহিউল্লাহর পিতা হাবিবুর রহমান, পেশা রাজমিস্ত্রী। ১৩৬২ সনের ১১ ফাল্গুন সাপ্তাহিক *নতুন দিন* পত্রিকার সংবাদে জানা যায়, ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি নবাবপুর রোডে খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে অহিউল্লা গুলিবিদ্ধ হন, গুলি লাগে তার মাথায়। পুলিশ অতি দ্রুত তাঁর লাশ ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেয়, গায়েব করে দেয়।

তাঁদেরই আত্মত্যাগে

ভাষা-আন্দোলনে কতজন শহীদ হয়েছিলেন তার সঠিক সংখ্যা অজানাই রয়ে যাবে। শুধু ছাত্র নন, ওই মহান আন্দোলনে মৃত্যুবরণ করেছিলেন সাধারণ মানুষও। মরদেহ ও পরিচয় পাওয়া গেছে মাত্র সাতজনের, অবশিষ্ট শহীদেরা বিস্মৃতির পাতায়, কারণ মুসলিম লীগ সরকারের পুলিশ অধিকাংশ লাশ সরিয়ে ফেলে, গায়েব করে দেয়।

এখানে সাত অমর শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হলো।

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৯ ফাল্গুন ১৪১৮
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বাণী

একুশে ফেব্রুয়ারি মহান 'শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। আমি এ দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী ভাষা শহীদ বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা শহীদদের। আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। এ দিবস উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ আন্দোলন কেবলই আমাদের মাতৃভাষার দাবি আদায় করেনি; বরং তা বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায় এবং স্বাধিকার অর্জনে বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ করে। এ আন্দোলনের পথ বেয়ে ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় বাঙালি জাতির বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। আমি আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সকল ভাষাশহীদ ও ভাষাসৈনিককে; যাঁদের অসীম সাহস ও অদম্য প্রেরণায় ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি অর্জন করে মাতৃভাষার অধিকার। ভাষা আন্দোলন আমাদের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির লালনসহ সামনে এগিয়ে যাওয়ার অফুরন্ত প্রেরণা যোগায় এবং সকল অন্যায়, অবিচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উজ্জীবিত করে।

কোন জাতির আত্মত্যাগ কখনো বৃথা যায় না। আমরা গর্ববোধ করি এই ভেবে যে 'শহীদ দিবস' আজ পরিণত হয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে'। আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের যে গভীর তাৎপর্য তার অনুরণন আজ আমরা সারাবিশ্বে দেখতে পাই 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে। অমর একুশে তাই কেবল আমাদের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রাকে অনুপ্রাণিত করছে না; বরং তা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে লালন ও সংরক্ষণে উৎসাহ যোগাচ্ছে। মূলত মহান ভাষা দিবস আজ পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছে, বিশ্ববাসীকে করেছে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ।

ভাষা ও সংস্কৃতি হাত ধরাধরি করে চলে। পৃথিবীর বর্ণাঢ্য ভাষা ও সংস্কৃতির বহমান ধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে লুপ্তপ্রায় ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় বিশ্ববাসী আরও অবদান রাখবেন বলে আমার বিশ্বাস। পৃথিবীর সব নৃতাত্ত্বিক জাতি-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষিত হোক, গড়ে ওঠুক এক শান্তিপূর্ণ বিশ্ব, মহান 'শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে'–এই আমার প্রত্যাশা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভাষার উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও বিকাশে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আমি তার সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৯ ফাল্গুন ১৪১৮
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বাণী

মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষাভাষীসহ বিশ্বের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির জনগণকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে শোক, শক্তি ও গৌরবের প্রতীক। ১৯৫২ সালের এ দিনে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছিলেন রফিক, জব্বার, বরকত, শফিউর, সালামসহ আরও অনেকে।

আজকের এই দিনে আমি ভাষাশহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানাই বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সকল ভাষা-সৈনিকদের প্রতি।

১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডাকে। এদিন সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন। ১৫ মার্চ তারা মুক্তি পান। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিবুর রহমান। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে।

ওই বছরের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবারও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে মুক্তি পান। ১৪ অক্টোবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করা হয়। কারাগার থেকেই তার দিকনির্দেশনায় আন্দোলন বেগবান হয়। সেই দুর্বার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর জারি করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন ভাষাশহীদরা।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি সেই রক্তস্নাত গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয়। কানাডা প্রবাসী কয়েকজন বাঙালির উদ্যোগ ও প্রস্তাবে এবং আওয়ামী লীগ সরকারের সহায়তায় ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

আজ সারা বিশ্বের সকল নাগরিকের সত্য ও ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

বিশ্বের ২৫ কোটি মানুষের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য আমি ইতোমধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাবি উত্থাপন করেছি।

বিশ্বের সকল ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা এবং ভাষা সংরক্ষণের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন পাশ করা হয়েছে।

'অমর একুশে' আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। একুশের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা এবং নিরক্ষরতামুক্ত আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। গত তিন বছরে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি।

আসুন, সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে আমরা ঐক্যবদ্ধ কাজ করার শপথ নিই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

০৯ ফাল্গুন ১৪১৮
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বাণী

ভাষা মানুষের জন্মগত অধিকার। জন্মের পর থেকেই মানুষ মাকে চেনে। মানব শিশুর মধ্যে মাতৃভাষা বিষয়ক সংবেদনার সৃষ্টি হয় তার ভূমিষ্ঠ হওয়ারও আগে। মাতৃভাষা যথার্থই মাতৃদুগ্ধস্বরূপ। ভাষার অন্য গুরুত্বও রয়েছে। আমাদের সব ধরনের আবেগ ও অনুভূতি ভাষার মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করি। জাতির দৃশ্যমান ও অদৃশ্য ঐতিহ্য, তার সংস্কৃতি, জীবনভাবনা ও জীবনদর্শন ভাষার মাধ্যমেই ব্যক্ত হয়। অধুনা আমরা মানুষে-মানুষে সহমর্মিতা ও সৌহার্দবোধ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সবার বাস-উপযোগী এক বিশ্ব বিনির্মাণের কথা বলছি। ভাষাকে বাদ দিয়ে তা কখনোই সম্ভব নয়। এজন্য জাতিসংঘের ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষা, বহুভাষিকতাকে উৎসাহ দান, প্রযুক্তিতে সকল মাতৃভাষার ব্যবহার, বিপন্ন ভাষাসমূহ সংরক্ষণ ও বিকাশ সাধনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

ভাষাগত পরিচয় বহু দেশ ও বহু নৃ-গোষ্ঠীর জাতিগত পরিচিতি। আমরাও সেভাবে পরিচিত ও আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে লালন করছি। কিন্তু আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপরিচয় রক্ষার পথ কখনোই সহজ ছিল না। ইংরেজদের ভাষিক সাম্রাজ্যবাদের পথ ধরেই আসে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকচক্র। এ দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ভাষাকে অস্বীকার করে তারা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল উর্দু। ফলে শুরু হয় আমাদের অস্তিত্বের লড়াই; হয় চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া, অথবা বিজয়ী হয়ে নিজের অস্তিত্ব, মায়ের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। ইতিহাসই প্রমাণ দেয় যে, জাতীয় জাগরণ ঘটলে সেই মহাস্রোতে সব স্বৈরশাসক ও কুচক্রীমহল ভেসে যায়, বিজয়ী হয় সাধারণ মানুষ, তাদের মিলিত প্রচেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা। ১৯৫২ সনে এ দেশবাসী বিশেষত, অপার সম্ভাবনাদীপ্ত তরুণসমাজ বুকের রক্ত দিয়েই প্রতিষ্ঠিত করেছে বাংলা ভাষার অধিকার ও বাঙালি জাতির স্বাতন্ত্র্য। বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার, শফিউর শুধু ভাষা শহীদ নন, তাঁরা আমাদের সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁদের কাছ থেকেই আমরা গণতান্ত্রিক আদর্শকে লালন ও প্রতিষ্ঠা, সব শোষণ ও অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠা ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ ও সকলের মিলিত চেষ্টায় জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার শিক্ষা পাই। মাতৃভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই আমাদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। এই চেতনার ধারাবাহিকতায় আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে হবে। আমাদের নতুন প্রজন্মকেও সেভাবে, সেই চেতনায় গড়ে তুলতে হবে।

অমর একুশ এখন শুধু বাঙালির সংগ্রামী প্রেরণার উৎস নয়। এ চেতনা এখন সারা বিশ্বে প্রসারিত। একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অমর একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি সবিশেষ আনন্দিত। এ আয়োজনকে আমি ঐতিহ্য ও পূর্বসূরিদের ঋণ স্বীকারের প্রচেষ্টা হিসেবেই মনে করি।
আমি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সকল আয়োজনের সাফল্য কামনা করি।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি)

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৯ ফাল্গুন ১৪১৮
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বাণী

তোমার জন্য একুশে ফেব্রুয়ারি
আলাদা রকম ইতিহাস পেয়ে গেছি
আলাদা রকম এক কবিতার ভাষা
আলাদা রকম অবিনাশী কথামালা

বাঙালি চেতনায় একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু আত্মত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল নয়, একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির নব ইতিহাসের নির্মাতাও। বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ শহীদদের আত্মত্যাগের শোণিততপ্ত পথ বেয়ে বাংলা ও বাঙালির গৌরবগাথা আজ বিশ্বসভায়ও স্বীকৃত। বাঙালির ভাষা চেতনার পথ বেয়ে আজ সারা বিশ্বে মাতৃভাষার প্রতি জনগণের আবেগ ও ভালোবাসার গভীর অনুরাগ প্রকাশিত হচ্ছে। মাতৃভাষাপ্রেমী কয়েকজন প্রবাসী বাঙালির প্রচেষ্টায় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াসে ১৭ই নভেম্বর ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ গৌরব আজ যেমন বাংলা ভাষাভাষী মানুষের, তেমনি বিশ্বের সকল জাতির।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট ভবনের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন। ইন্সটিটিউটের প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। গত ১৮ই অক্টোবর, ২০১১ তারিখে একনেক সভায় ৫৪৭৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ইন্সটিটিউট-ভবন ও মিলনায়তনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণসহ জাদুঘর, সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হবে যা এ-প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ দেবে।

ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান ভাষাবিদ, নৃবিজ্ঞানী, লেখক, বুদ্ধিজীবী এ-প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়েছেন। বিভিন্ন ভাষার উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষার পুনরুজ্জীবনে এ-প্রতিষ্ঠান থেকে বিবিধ গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাদুঘরে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ, জাতি ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা, লিপির নিদর্শন সংরক্ষণ করা হচ্ছে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গবেষণা বিনিময়ের উদ্যোগও গ্রহণ করা হচ্ছে।

আমরা বিশ্বাস করি বর্তমান সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ ও অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট এক অনন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সকল অনুষ্ঠানে আপনাদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)

একুশের ঋণ

রফিকুল ইসলাম

একটি প্রাচীন ভূখণ্ড, ক্রমান্বয়ে সাগর থেকে জেগে ওঠা এবং বিশাল ব-দ্বীপ অঞ্চল। দেশটি নদীমাতৃক, পৃথিবীর কয়েকটি দীর্ঘতম নদীর প্রবাহ বঙ্গোপসাগরে এসে মিশেছে। অঞ্চলটি স্বাভাবিকভাবেই সুজলা, সুফলা ও শষ্যশ্যামলা। এই ভূখণ্ড প্রাচীনকালে কয়েকটি জনপদে বিভক্ত ছিল; যেমন – রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট প্রভৃতি। এইসব জনপদে মূলত তিনটি নৃগোষ্ঠীর মানুষ সববাস করত। তারা ছিল অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং তিব্বতি-বর্মি জাতির মানুষ। এইসব জনগোষ্ঠীর কোনো একক সাধারণ ভাষা ছিল না অর্থাৎ, বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক কালে কোনো একক জনগোষ্ঠী বা ভাষাভাষী বসবাস করত না। সপ্তম থেকে দশম শতকের মধ্যে এ অঞ্চলে উত্তর-ভারত থেকে মগধ হয়ে আর্য ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের আগমন ঘটে। এ অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীর উপরে আর্যভাষা ও সংস্কৃতি আরোপিত হয়। আর্যদের ধর্মীয় ভাষা ছিল সংস্কৃত। কিন্তু এ অঞ্চলে যখন আর্যীকরণ হয় তখন প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাযুগের বৈদিক ও সংস্কৃত, মধ্যভারতীয় আর্যভাষা যুগের প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার মধ্য দিয়ে বাংলা, অসমি, ওড়িয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ শুরু হয়ে গেছে।

বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাভাষী অঞ্চল হলো বাংলাদেশ এবং ভারতের ঝাড়খণ্ডের অংশবিশেষ; ত্রিপুরা, অসমের বরাক উপত্যকা অর্থাৎ, কাছাড়, করিমগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল। প্রাচীনকালে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলে প্রথম বাংলাভাষায় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। তাঁদের সৃষ্টিই বৌদ্ধগান ও দোঁহা বা চর্যাপদ নামে পরিচিত। মধ্যযুগের বাংলার আদিপূর্বে কর্ণাটকি ব্রাহ্মণগণ সেন রাজাদের আমলে সংস্কৃত ছিল রাজভাষা। বাকি পুরো মধ্যযুগ জুড়ে তুর্কি, পাঠান এবং মোগল আমলে ফারসি ছিল দরবারি ভাষা আর ইংরেজ আমলে সরকারি ভাষা ছিল ইংরেজি। মধ্যযুগ থেকে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যিকগণ বাংলাভাষায় সাহিত্যচর্চা করেন বাংলার নিজস্ব লিপি বা বর্ণমালায়। সেজন্য অবশ্য তাদের স্ব-স্ব সমাজের মৌলবাদীদের রুদ্ররোষে পড়তে হয়েছিল। যেসব হিন্দু সাহিত্যিক দেব-দেবীদের কথা সংস্কৃতভাষা এবং দেবনাগরি হরফে না-লিখে বাংলাভাষা ও বর্ণমালায় লিখছিলেন, ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা তাদের স্থান নির্দেশ করেছিলেন রৌরব নরকে। আরবি-ফারসি শব্দ মিশ্রিত বাংলা ভাষায় কাব্যরচনার কারণে মধ্যযুগের শেষ পাদের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রকে পর্যন্ত আত্মপক্ষ সমর্থন করে 'যাবনী' মিশাল ভাষায় কাব্য রচনার কারণ হিসেবে বলতে হয়েছিল 'যেহোক সেহোক ভাষা কাব্যরস লয়ে'। অপর দিকে আল্লাহ্, রসুল ও কোরান হাদিসের কথা আরবি-ফারসি ভাষা ও হরফে না-লিখে যেসব মুসলমান কবি বাংলা ভাষা ও বাংলা বর্ণমালায় লিখেছিলেন, তাদের জন্য মৌলবাদী কাঠ মোল্লারা বরাদ্দ করেছিলেন 'হাবিয়া দোজখ'। এই একদেশদর্শী ও অন্তঃসারশূন্য গোষ্ঠীর উদ্দেশেই সতেরো শতকের কবি আবদুল হাকিমের সেই বিখ্যাত উক্তি : *যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী*
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।

সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে বাঙালি হিন্দু সাহিত্যিকেরা সংস্কৃত, বাংলা ও ফারসি ভাষা এবং ইংরেজ আমলে ইংরেজি ভাষার চর্চা করেছেন। বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকেরাও মধ্যযুগে কমবেশি আরবি ফারসি, সংস্কৃত এবং বাংলাভাষার চর্চা করেছেন। খ্রিষ্টান মিশনারিরা মূলত বাংলাভাষা, ব্যাকরণ ও অভিধান চর্চায় পথিকৃতের কাজ করেছিলেন। ইংরেজ আমলে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় দীর্ঘকাল উৎসাহ ছিল না। সর্বোপরি বিশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান সমাজে, পত্র-পত্রিকায় বিতর্ক চলেছিল বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দু না বাংলা। নবাব আবদুল লতিফ রায় দিয়েছিলেন যে, 'আশরাফ' বা উচ্চ শ্রেণির বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দু আর 'আতরাফ' বা নিম্নশেণির কিংবা ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা। বস্তুত, বাঙালি মুসলমান সমাজে ঐতিহাসিকভাবে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা নিয়ে একটা হীনমন্যতা বজায় ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে একশ্রেণির রাজনীতিবিদ ঐ হীনমন্যতার স্বীকার হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে যে-ধারণা কাজ করছিল, তা হলো, যেহেতু হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি সেহেতু হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে হিন্দি; আর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। তারা হিন্দি ও উর্দু ভাষার অভিন্ন উৎস সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। দিল্লির একটি উপভাষাকে কেন্দ্র করে মোগলবাদশাহ আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে মোতায়েন মোগল সেনা শিবির থেকে উর্দু ভাষার সৃষ্টি। 'উর্দু' নামটা এসেছে সামরিক পোশাক (ইউনিফরম) 'উর্দি' থেকে। মোগল সেনাবাহিনী ছিল বহুজাতিক। এ বাহিনীতে ছিল মোগল-পাঠান ছাড়াও রাজপুত এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন ভাষাভাষী সৈনিক। তাদের মধ্য থেকেই উর্দু নামক মিশ্রভাষার জন্ম, তবে উর্দুভাষা ফারসি হরফে এবং হিন্দি ভাষা দেবনাগরি হরফে লিখিত হওয়ায় একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে, হিন্দি ভারতীয় হিন্দুদের আর উর্দু ভারতীয় মুসলমানদের ভাষা। যদিও ঐ দুই ভাষার সংগঠনের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে এবং ইংরেজ আমলে তা হিন্দুস্তানি নামে রাজভাষারূপে চালু ছিল।

ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে 'হিন্দি' ভারতের এবং 'উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। অথচ অবিভক্ত ভারতে যেমন মুসলমানদের মধ্যে বাংলাভাষীরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ তেমনি নবগঠিত পাকিস্তানেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বাঙালি। কিন্তু ১৯৪৮ সাল

থেকে বাংলা ভাষা পাকিস্তান গণপরিষদে অন্যতম ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হলে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপিত এবং ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৫২ সালে এ দাবি বা আন্দোলনে চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটে। বাংলাভাষার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ১৯৫২ সালের ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বাঙালিকে রক্ত দিতে হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ঘটনা নজিরবিহীন। এ কারণেই ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি একটি অবিস্মরণীয় দিন।

বায়ান্নর অমর একুশে আমাদের কী দিয়েছে? ১৯৫২ সালের ষাট বছর পরেও দু-হাজার বারো সালে আমরা 'অমর একুশে'-কে নতুনভাবে স্মরণ করছি কেন? ১৯৫৩ সাল থেকে কেনোই-বা প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবসরূপে পালন করে আসছি? আমরা কেনো প্রতিবছর একুশেতে ভাষা শহীদানের কবরে এবং শহীদ মিনারে ফুল দিচ্ছি? একুশে ফেব্রুয়ারিতে কেনো আমরা গাইছি : *আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি?* কেনোই-বা ১৯৫৩ সালে একুশের প্রথম সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারি* প্রকাশিত হয়েছিল? আবার ১৯৫৪ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ভাষাশহীদদের নিয়ে রচিত ও অভিনীত হয়েছিল *কবর* নাটক? এমন সব প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় আর তা হলো : ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি আমরা আমাদের বিস্মৃত জাতিসত্তাকে খুঁজে পেয়েছিলাম। আমরা সেদিন নতুন করে জানতে পেরেছিলাম, আমরা বাঙালি। আমরা আরো বুঝতে পেরেছিলাম, বাঙালি জাতির রয়েছে এক মহান সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল এ জাতির নতুন অভিযাত্রা।

বাঙালি জাতি কয়েক শত বছরের পরাধীনতার যে গ্লানি বহন করেছে সে-সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। বাঙালি দীর্ঘকাল বহিরাগতদের দ্বারা শাসিত, শোষিত, লুণ্ঠিত ও পদদলিত ছিল। বাংলা লুণ্ঠন করেছে কখনো কর্নাটকি সেনরাজারা, কখনো তুর্কি, কখনো পাঠান, কখনো মোঘল, কখনো পোর্তুগিজ, কখনো মারাঠি, কখনো মগ, কখনো ইংরেজ আর শেষে পাকিস্তানি নামধারী পাঞ্জাবি বা পুন্‌জাবির দ্বারা। একের পর এক প্রভুকে সালাম জানাতে গিয়ে বাঙালির শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। বাঙালির ললাটে যেন চির দাসত্বের এ অভিশাপ উৎকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ বাঙালি প্রথম যথার্থভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, প্রতিবাদ জানিয়েছিল। রক্ত দিয়েই একুশের রক্তের পথ বেয়ে বাঙালি ৬২, ৬৬, ৬৯ অতিক্রম করে ৭১-এ পৌঁছেছে। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়। বলা যেতে পারে একুশ থেকে একাত্তর – একই সূত্রে গাঁথা। একুশে না-হলে একাত্তর হতো কিনা সন্দেহ আছে। একুশে না-হলে আমরা হারাতাম আমাদের মাতৃভাষা, ফিরে পেতামনা আমাদের জাতিসত্তা। আমরা পাকিস্তানিদের গোলাম হয়ে থাকতাম। একুশের রক্ত ৬২, ৬৬, ৬৯ ও ৭১-এর রক্তধারার একই প্রবাহ, একই স্রোত যা এনে দিয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। আমাদের মাতৃভাষা পেয়েছে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। একুশে ফেব্রুয়ারি পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি। বাংলাভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালে এবং তা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল ১৯৫২-তে। ৪৮ ও ৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মূল দাবি ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। ভাষা আন্দোলনের ছয় দশক এবং স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরে স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা কি যথার্থ রাষ্ট্রভাষা হতে পেরেছে ? এ কথা ঠিক যে, বাহাত্তর সালের সংবিধানে বাংলা ভাষা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাসে এই প্রথম বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেল। এটা সম্ভব হয়েছে একুশ ও একাত্তরের জন্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে ১৯৭৪ সালে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। সে-ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি জাতিসংঘে একাধিকবার বাংলাভাষাতে ভাষণ প্রদান করেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরূপে একুশে ফেব্রুয়ারির স্বীকৃতি এবং বাংলাভাষাকে জাতিসংঘে অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা ঘোষণার দাবি উত্থাপন শেখ হাসিনার কৃতিত্ব। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আনুষ্ঠানিক ভাষা বাংলা। সচিবালয়ে বাংলাভাষার ব্যবহার এখন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এসব ঘটনা নিশ্চিতরূপে অমর একুশের অবদান।

এখন বিচার্য স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রয়োগ হচ্ছে কিনা? প্রথমত, আইন আদালতে বাংলাভাষার ব্যবহার কতটা হচ্ছে তা বিচার্য। নিম্ন-আদালতে বাংলাভাষা ব্যবহৃত হলেও উচ্চ-আদালতে তা হয়নি। বাংলাদেশের মৌলিক আইনসমূহ ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ। সেগুলি বাংলায় রূপান্তরের কোনো উদ্যোগ গত চার দশকে গৃহীত হয়নি। এরপর আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাভাষার স্থান বিবেচনা করা যেতে পারে। আমাদের দেশে নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারায় রয়েছে বাংলা মাধ্যম। এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে উপস্থিত ইংরেজি ও আরবির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা। বাংলার মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অর্থাৎ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত ইংরেজি ও বাংলাভাষা বাধ্যতামূলক কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজি বা বাংলা বিভাগে ভর্তি না হলে ঐ দুটি ভাষা শিক্ষার তেমন সুযোগ নেই।

বিজ্ঞান, কারিগরি, প্রযুক্তি ও চিকিৎসা বিষয়ক উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাভাষার কোনো ভূমিকা রয়েছে কিনা সন্দেহ। ইংরেজির মাধ্যমে পরিচালিত স্কুল কলেজগুলিতে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা খুবই সীমিত। ও-লেভেলে ১০০ নম্বরের বাংলা থাকলেও এ-লেভেলে বাংলার স্থান নেই। বেসরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশে গত দু-দশকে ৫০টির বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটিতে আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে ১০০ নম্বরের একটি বাংলাভাষার কোর্স বাধ্যতামূলক। এছাড়া দুটি কি তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাবিভাগ খোলা হয়েছে; আর দুয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের দুয়েকটি কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হয় ১৯৯২, ১৯৯৮, ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন দ্বারা। এসব আইনে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কে কোনো ধারা নেই।

বাংলাদেশের শিক্ষার তৃতীয় ধারা মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা।

বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষার দুটি ধারা রয়েছে – একটি হলো সরকারি মাদ্‌রাসা বোর্ড নিয়ন্ত্রিত। এসব মাদ্‌রাসায় আগে ১০০ নম্বর করে ইংরেজি ও বাংলায় দুটি পত্র ছিল। সম্প্রতি তা বাড়িয়ে ২০০ নম্বর করা হয়েছে। এর ফলে মাদ্‌রাসার ছাত্ররা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে। মাদরাসা শিক্ষার অন্যতম ধারা বেসরকারি কওমি মাদ্‌রাসা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার উপর শিক্ষামন্ত্রণালয় কিংবা মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের কোন সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ আছে বলে মনে হয় না। এসব মাদ্‌রাসার অর্থায়নের উৎস সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। কওমি মাদ্‌রাসার পাঠ্যসূচিতে কোনো প্রকার সমতা আছে কিনা তাও স্পষ্ট নয়। ধারণা করা হয় যে, সেখানে বাংলা বা ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ সুযোগ নেই। এসব মাদ্‌রাসায় আরবি শিক্ষার ব্যবস্থা কতটুকু বা কোন্ মানের সে-সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া কঠিন।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যে চিত্র তুলে ধরা হলো তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বাংলার মাধ্যমে পরিচালিত স্কুল কলেজগুলিতে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক এবং বিএ পাস পরীক্ষায় বাংলাভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের সুযোগ রয়েছে। একই কথা মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্ত মাদ্‌রাসাগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য। আমাদের স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চলতি রীতির বাংলা ভাষায় রচিত কিন্তু শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকদের অধিকাংশই প্রমিত বাংলাভাষা ব্যবহারে পারদর্শী নন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকগণ সচরাচর আঞ্চলিক প্রভাবমুক্ত ভাষায় পাঠদান করে থাকেন। পৃথিবীর সব দেশের সব ভাষাতেই আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বা উপভাষা রয়েছে। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে বা আনুষ্ঠানিক প্রতিবেশে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয় না। ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশ যেখানে প্রমিত ভাষায় শিক্ষাদানের ঐতিহ্য অনুসৃত হচ্ছে না। ফলে শিক্ষার্থীরা প্রমিত বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিখতে পারছে না। আরবি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজমান অনুমান করি। ফলত, বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক প্রতিবেশে প্রমিত ভাষার ব্যবহার ক্রমশই সীমিত হয়ে আসছে।

আমাদের প্রচার মাধ্যমের ভাষা বাংলা। সরকারি বেতার ও টেলিভিশনে এবং বেসরকারি টেলিভিশনে প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়; কিন্তু দুটি বাদে একাধিক বেসরকারি এফএম বেতারে ইচ্ছাকৃতভাবে ইংরেজি-বাংলা মিশ্রিত এক খিচুড়িভাষা ব্যবহৃত হয় যা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। বিভিন্ন টেলিভিশনে যে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান (সিরিয়াল) প্রচারিত হয়, সেখানেও বিভিন্ন উপভাষার মিশ্রণে এক জগাখিচুড়ি ভাষায় সংলাপ শোনা যায়। ফলে প্রচার মাধ্যমসমূহ বাংলাভাষার ব্যবহার ব্যাপক হলেও তার মাধ্যমে বাংলা ভাষার ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধ প্রমিতরূপের পরিবর্তে বাংলা ভাষার এক বিচিত্র মিশ্ররূপের পরিচর্যা ঘটে। বাংলাদেশের বাংলা পাঠ্যপুস্তকসমূহে এবং সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার চলতি বা প্রমিতরূপ ব্যবহৃত। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে বা প্রচার মাধ্যমে বাংলাভাষার প্রমিতরূপের ব্যবহার সার্বজনীন নয়। এ অবস্থায় এ দেশের বাংলাভাষা ব্যবহারের মান উন্নত হচ্ছে না।

তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশের বাংলাভাষার ব্যবহার ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের প্রকাশনা শিল্প এখন সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিনির্ভর যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কি-বোর্ড ও সফট্‌ওয়্যার উদ্ভাবনের এখনো বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। মোবাইল ফোনে এসএমএস এবং ইন্টারনেটের ফেস্‌বুকে রোমান হরফে বাংলাভাষা ব্যবহার হওয়ায় ভাষার বিকৃতি অবধারিত। এ সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। প্রতিদিন অন্‌লাইনে যদি পত্রিকা পড়া যায় তাহলে মোবাইলে বা ফেস্‌বুকে কেনো বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করা যাবে না? এদিকে তথ্যপ্রযুক্তিবিদ্‌দের দৃষ্টি প্রদান করা উচিত। বস্তুত, বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটের বাংলাভাষার ব্যবহার এখনো পুরোপুরি শুরু হয়নি। এসব ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনা রয়েছে তা পূরণের উদ্‌যোগ নেওয়া উচিত। ইউরোপীয় ভাষাসমূহের ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজনবোধে ইংরেজি ভাষার রূপান্তর ঘটানো যায় বাংলাদেশেও তেমনি বাংলা ও ইংরেজির মধ্যে বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবন প্রয়োজন। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বাংলাভাষা ও সাহিত্য প্রচার ও প্রসারের যে সম্ভাবনা রয়েছে তার সদ্ব্যবহার সময়ের দাবি।

জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনে সবচেয়ে অবহেলিত ক্ষেত্র হচ্ছে সরকারি সেবামূলক খাতসমূহ। টেলি ও ডাক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, ওয়াসা, গ্যাস প্রভৃতির মাসিক বিল গ্রাহকদের কাছে ইংরেজি ভাষায় প্রেরিত হয়। যাদের কাছে ঐ সব বিল পাঠানো হয় তাদের অধিকাংশ ইংরেজিভাষা বোঝেন না, যেমন তারা বোঝেন না সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের ইংরেজি ভাষায় লিখিত ওষুধ ও ব্যবস্থাপত্র। প্রশ্ন ওঠে এইসব সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সেবা কি কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই প্রদান করা আবশ্যিক? ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। স্বাধীনতার আগে পাকিস্তানি আমালে বাংলা প্রচলন আন্দোলনের ফলে গাড়ির নম্বর প্লেট থেকে শুরু করে রাজপথের সমস্ত স্থাপনার বিপণিকেন্দ্র এবং দোকানপাটের নামফলক বাংলা হয়ে গিয়েছিল; অন্যথা সেগুলিকে জনতার রুদ্ররোষে পড়তে হতো। পরম পরিতাপের বিষয়, স্বাধীনতার পর বছর পাঁচেক সে-অবস্থা চলতে থাকলেও তারপর অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সব স্থাপনা ও দোকানপাটের নাম ফলক রোমান হরফে লিখিত হতে শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্র ইংরেজি বা বাংলায় নামফলক এবং বসতবাড়ির নাম রোমান হরফে লিখিত।

একুশ শতকে এসে বাংলাভাষা ও বর্ণমালার প্রতি আমাদের অবহেলা এবং মাতৃভাষা নিয়ে আমাদের হীনমন্যতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ভাষা ব্যবহারে আমাদের অসচেতনতা ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধ বাংলাভাষাকে স্থূল, অমার্জিত, অপরিশীলিত ভাষায় পরিণত করে ফেলেছে যে-ভাষা ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, সেই ভাষা এখন টেলিভিশন, নাটক ও ধারাবাহিকে ঢুকে পড়েছে কবেই। দর্শক-শ্রোতা ক্রমশ বিদেশি টেলিভিশনমুখী হয়ে পড়ছে। ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা। তারা ঘরে, বাইরে, বিদ্যালয়ে কোথাও মার্জিত পরিশীলিত, মননশীল ও প্রমিত বাংলাভাষার শেখার সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে তাদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সব পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমরা ঘরে-বাইরে সর্বত্র বাজারের ভাষা ব্যবহার করছি। বর্তমান বাংলাদেশে মুখের বা লেখার ভাষার শুদ্ধ-অশুদ্ধ ভাষার

ব্যবধান ঘুচে গেছে।

অমর একুশের কারণে আমরা পেয়েছি শহীদ মিনার, বাংলা একাডেমী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশ্বায়ন এবং ভাষা সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে আজ বিশ্বের অধিকাংশ ভাষা হুমকির মুখে। একদিকে যেমন বিশ্বে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর অনেকদেশ সমুদ্রে বিলীন হতে চলেছে; তেমনি ভাষা সাম্রাজ্যবাদের সর্বগ্রাসী তাণ্ডবে বিশ্বের বহুভাষা বিলীন হবার পথে রয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে আমরা সেইসব বিপন্ন ভাষার পরিচয় পেতে চাই। কারণ বাংলাভাষার অস্তিত্বও আজ হুমকির মুখে। ঘরে-বাইরে তার শত্রু। একদিকে ভাষা সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন অপরদিকে মাতৃভাষার প্রতি বাঙালির চরম উদাসীনতা ও অবহেলা। একুশ শতকের বিশ্বে সেসব ভাষাই আত্মরক্ষা করতে পারবে, যেসব ভাষার ব্যবহারকারী তাদের মাতৃভাষা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল, যত্নশীল, রক্ষণশীল ও গৌরবান্বিত।

বিশ্বের প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এবং বাংলাদেশের মানুষের পরিবেশ ধ্বংসের জন্য বাংলাদেশ আজ সমুদ্রসীমার উচ্চতা বৃদ্ধির কবলিত হবার বিপদসীমার প্রথম সারিতে অবস্থিত। অপর দিকে ভাষা সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে কারণে-অকারণে বাংলা ভাষাকে বিসর্জন প্রদান এবং মাতৃভাষার প্রতি একশ্রেণির উচ্চবিত্ত মানুষের অশ্রদ্ধার জন্য ঐতিহ্যবাহী বাংলাভাষা আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। এহেন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্তব্য বাংলা তথা বিভিন্ন বিপন্ন ভাষা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করে তোলা। কিন্তু তার প্রাথমিক দায়িত্ব বাংলাদেশে বাংলা ভাষার বিপদ সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষকে সচেতন করা এবং বাংলা ভাষার সম্ভাবনার দিকগুলিকে তাদের সামনে তুলে ধরা। আমরা প্রয়োজনে অবশ্যই বিদেশি ভাষা শিখব কিন্তু তা মাতৃভাষার বিকল্প হিসেবে নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, বাংলা আমাদের প্রথমভাষা আর দ্বিতীয় ভাষা হচ্ছে ইংরেজি বা আরবি। সরকারি ভাষানীতিতে এই বাস্তবতার প্রতিফলন জরুরি। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলাভাষার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমেই একুশের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব।

ভা ল বা সি মা তৃ ভা ষা

শেখ হাসিনা

আমার ভাষা, মায়ের ভাষা, বাংলা ভাষা।

জন্মেই মাকে মা বলে ডাকি। মায়ের মুখের ভাষা থেকে বলতে শিখি। মনের কথা ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করি। যে ভাষা আমি সব থেকে ভাল বুঝতে পারি সে আমার মায়ের ভাষা। ভালবাসি ভালবাসি মাতৃভাষা ভালবাসি। সকল ভাষার সেরা ভাষা মাতৃভাষা। মাতৃভাষা প্রাণের ভাষা, আমার ভাষা।

সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় মায়ের ভাষাকে ভালবাসে। মায়ের ভাষা দিয়ে সব ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না হৃদয় জুড়ে সবটুকু বলা মায়ের ভাষা। এর থেকে সুন্দর, এর থেকে মধুর আর কী হতে পারে ?

মায়ের ভাষার কথা বলার অধিকার আদায় করতে রক্ত দিতে হয়েছিল বাংলাদেশের মানুষকে।

মা বলে ডাকার অধিকার আমাদের মুখ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। পারেনি কারণ, এই ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য রক্ত ঝরাতে হয়েছে। বুকের রক্ত দিয়ে লিখে দিতে হয়েছে মায়ের ভাষায় মাকে মা বলে ডাকব। এই আমার প্রাণের অধিকার। এ আমার অস্তিত্বের অধিকার। আমার জাতিসত্তার অধিকার। ২১শে ফেব্রুয়ারি এমনই একটি রক্তঝরা দিন। ১৯৫২ সালে এই দিনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর আরও কত নাম না জানা ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে লিখে গেল ভালবাসি মাতৃভাষা। সেই থেকে তো আমরা মাকে মা বলে পরাণ ভরে ডাকতে পারলাম।

এই বিশাল পৃথিবীর এক কোণে বঙ্গোপসাগরের তীরে ছোট একটি ভূখণ্ডের মানুষ সেদিন কী সাহস দেখিয়েছে। মাতৃভাষাকে ভালবেসে রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে আত্মত্যাগ করেছে, সে কথা স্মরণ করে প্রতি বছর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে বাংলার দেশপ্রেমিক সন্তানেরা বংশপরম্পরায়। শহিদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। শহিদ স্মৃতি অমর হোক। না, শহিদের রক্ত বৃথা যায়নি।

এই আত্মত্যাগের শিক্ষা নিয়েই তো ভালবেসেছি দেশকে। লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। পেয়েছি প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আমার দেশ, তোমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ।

শহিদের আত্মত্যাগের স্মৃতি আজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে গেছে। ছড়িয়ে গেছে বিশ্বময়। বিশ্বসভায় আজ মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি স্বীকৃতির জন্য। আর এই স্বীকৃতি বাঙালিই প্রথম বুকের রক্ত দিয়ে লিখে দিল তার সাহসের কথা। বাঙালিই প্রথম দেখাল এ অর্জনের পথ।

২১শে ফেব্রুয়ারি আজ আর শুধু একার নয়। সমগ্র বিশ্ব আজ এই দিনটি স্মরণ করবে। ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করবে, স্মরণ করবে, এই দিবসের অমর শহিদদের। আবিষ্ট হবে এই দিবসের তাৎপর্য শুনে, শুধুমাত্র মায়ের ভাষাকে বাঁচাতে একটি জাতি কী অসীম ব্যাকুলতা নিয়ে গর্জে উঠেছিল এক স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে। বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর যখন ২১ শে ফেব্রুয়ারি পালিত হবে সকলেই অনুপ্রেরণা পাবে, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখবে বাঙালি জাতি বীরের জাতি। ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে ঠিক যেমন রক্ত দিয়েছিল মেহনতি শ্রমিকদের শ্রমের মূল্য আদায় করতে ১মে আমেরিকার শিকাগো শহরে। আমরা ১লা মে শ্রমিক দিবসে আজও তাঁদের স্মরণ করি।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো দেশ স্বাধীন হয়। পাকিস্তান নামের দেশটির আবার দুটো খণ্ড। একটি পশ্চিম পাকিস্তান আর একটি পূর্ব পাকিস্তান। দুই ভূ-খণ্ডের মাঝে দূরত্ব ১২০০ মাইল। প্রায় ১ হাজার ৮৫২ কিলোমিটার। পূর্ব পাকিস্তান নামের অংশটির অধিবাসী বাংলা ভাষাভাষী। মূল ভূ-খণ্ডের নাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশে মানুষের মুখের ভাষা বাংলা ভাষা।

পাকিস্তান নামের দেশটির এই পূর্ব খণ্ড অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান নামে প্রদত্ত বাংলার মানুষ তখন গোটা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫ ভাগ বাঙালি।

বাংলার মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আবহাওয়া, জলবায়ু ভিন্ন। পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, জীবনাচরণ সবই আলাদা। শুধুমাত্র একটাই মিল। তা হল ধর্ম। এই অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। শুধুমাত্র ধর্মের নামে ১২০০ মাইল দূরের দুটো ভূ-খ- নিয়ে একটা দেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা। জন্মলগ্ন থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি বৈষম্যের শিকার হত। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হয়। জন্মের পর ৬ মাস পার হওয়ার আগেই শুরু হল ষড়যন্ত্র। করাচিতে এক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই শিক্ষা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। করাচির শিক্ষা সম্মেলনের খবর ঢাকায়, পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর খাজা নাজিমুদ্দিনের বাড়ির সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে সে বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এটাই প্রথম বিক্ষোভ মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে। ছাত্ররা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে জিন্নাহর ছবি সরিয়ে ফেলে। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ছাত্র লীগের জন্ম হয়। মাতৃভাষার মর্যাদার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য ছাত্ররা আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এক ফতোয়া দিলেন যে–উর্দু হল ইসলামের ভাষা আর হিন্দুদের ভাষা হল বাংলা, কাজেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা একমাত্র উর্দুই হতে হবে।

অথচ পাকিস্তানের আরও অনেক প্রদেশ রয়েছে, ভাষা রয়েছে। পাঞ্জাব দুই খণ্ডে বিভক্ত, পাকিস্তানে এক অংশ আর ভারতে আরেক অংশ। উভয় খণ্ডে পাঞ্জাবি ভাষা হিন্দু-মুসলমান সকলেই ব্যবহার করে। উর্দু কোনও জাতির মাতৃভাষা নয়। পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পুস্তু, বেলুচসহ আরও অনেক মাতৃভাষা পাকিস্তানে রয়েছে।

আর বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা। কিন্তু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করে মাতৃভাষার ওপর চরম আঘাত হানার চেষ্টা বাঙালিরা কোনও মতেই মেনে নিতে পারেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকেই যদি রাষ্ট্রভাষা করা হয়, তাহলে সমগ্র পাকিস্তানে বাংলাই হত রাষ্ট্রভাষা। অথচ যে ভাষায় মাকে মা বলে ডাকি, যে ভাষায় কথা বলি, সে ভাষা কেড়ে নেওয়ার এক নির্মম ষড়যন্ত্র শুরু হল। এ ষড়যন্ত্র বাঙালিরা কোনও দিনই মেনে নিতে পারে নি। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বাঙালি বদ্ধপরিকর।

১৯৪৮ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা করে দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে। বাংলার মানুষ এই ঘোষণায় বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে। খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম লীগ সরকারের এই হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অগ্রণী ভূমিকা নেন। ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। ২রা মার্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ফজলুল হক মুসলিম হলে। এই বৈঠকেই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন হয়। এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ বাংলার জনগণকে মুসলিম লিগ সরকারের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ করার জন্য প্রচারাভিযান শুরু করে। বিভিন্ন অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণসংযোগ করতে থাকে।

১১ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহবান করা হয়। বাঙালির বিরুদ্ধে, বাংলাভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্তকে, রুখে দাঁড়াবার জন্য এই ধর্মঘট। ১১ই মার্চের ধর্মঘটের দিনে ছাত্ররা সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ওই বিক্ষোভে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তার যেন আগুনে ঘৃতাহুতি। বাংলাদেশের সমগ্র ছাত্রসমাজ যখন জানতে পারে ঢাকায় ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বিক্ষোভে তারা রাস্তায় নামে। প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলনের চাপে ১৫ই মার্চ বন্দিদের মুসলিম লীগ সরকার মুক্তি দেয়।

১৯৪৮ সালের ২১ শে মার্চ মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ঢাকায় এলেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর এটা তাঁর প্রথম সফর এই ভূ-খণ্ডে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে। তাঁকে বলা হত 'কায়েদে আজম' অর্থাৎ পাকিস্তানের জাতির জনক। সেই পাকিস্তানের জাতির জনক পাকিস্তানের এই ভূ-খণ্ডে এলে তাঁকে বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়।

বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল কয়েকজন যুবক। যখন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যাত্রা শুরু করেন, তখন এই যুবকেরা বিক্ষোভ করে, অবশ্য পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেখান থেকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং বন্দি করে রাখে যতক্ষণ সমাবর্তন শেষ না হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে, এ কথা ইংরেজি ভাষায় পুনর্ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই সমাবর্তনের উপস্থিত ছাত্ররা নো, নো বলে প্রতিবাদ জানায়। সদম্ভে সারা বাংলাদেশ বিক্ষোভে ফুঁসতে থাকে।

আমাদের সময়ে সকল আন্দোলনের পীঠস্থান যেমন ছিল বটতলা, সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন, সংগ্রাম, মিটিংয়ের জায়গা ছিল আমতলা। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বহির্বিভাগ যে স্থানে, ঠিক সেই স্থানে।

সেই আমতলায় ১৬ই মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ছাত্রসভার আয়োজন করা হয়। ছাত্রদের সঙ্গে জনতাও এসে যোগদান করে। পুলিশ সেখানে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। বাধার মুখে বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে জনসভা শুরু হলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস মেরে সভায় হামলা চালায়।

সেই হামলার প্রতিবাদে ১৭ই মার্চ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয়, আন্দোলনে নতুন গতি পায়। শুধু ঢাকায় নয়, সমগ্র বাংলাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ছাত্রনেতারা জেলায় জেলায় সফর শুরু করে।

১১ই সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্তি পান। মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করার জন্য ২৩ শে জুন গঠন করা হয় বাংলাদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগ। আওয়ামী শব্দের অর্থ জনগণ। মুসলিম লীগকে সমাজের উঁচু শ্রেণির দল হিসেবে চিহ্নিত করে জনগণের সংগঠন হিসেবে জন্ম নিল আওয়ামি মুসলিম লীগ। পরবর্তী সময়ে এই দলকে অসাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার জন্য 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামি লীগ নাম দেওয়া হয়। ভাষার দাবি এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি আদায়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার সময় বন্ধবন্ধু ১৯শে এপ্রিল আবার গ্রেপ্তার হন। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান।

এদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে তখন অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং প্রচণ্ড খাদ্য ঘাটতি ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজমান অথচ মুসলিম লীগ সরকারের সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দেশের এই বিরাজমান খাদ্য ঘাটতির বিরুদ্ধে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। বঙ্গবন্ধু ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন, ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তিনি মুক্তি পান।

১১ই অক্টোবর নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নুরুল আমিনের পদত্যাগ দাবি করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আন্দোলনকে আরও বেগবান করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।

খাদ্য সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করে বলে খাদ্যের দাবিতে আরমানিটোলা থেকে ময়দানে জনসভা ও ভুখা মিছিল থেকে ১৪ অক্টোবর মওলানা ভাসানি ও বঙ্গবন্ধুসহ অন্য নেতারা গ্রেপ্তার হন। পরে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান ১৯৫১ সালে ১৬ই অক্টোবর ঘাতকের হাতে

নিহত হন। খাজা নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্রপ্রধান হন। পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের গ্রেপ্তার করে বিক্ষোভ দমাতে পেরে খাজা নাজিমুদ্দিন পুরস্কৃত হন। ২৫শে জানুয়ারি, ১৯৫২ রাষ্ট্রপ্রধান হয়েই তিনি ঘোষণা করলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে জেলখানা থেকে বঙ্গবন্ধু যোগাযোগ করলেন। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা ও বন্দি মুক্তির দাবিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি 'দাবি দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। বঙ্গবন্ধু অনশন করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। মহিউদ্দিন আহমদ তাঁর সঙ্গী হলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা দেওয়া হল। অনশন শুরু করার কারণে বঙ্গবন্ধুকে তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছে। সেখানে বসেই তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন, ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়ে বঙ্গবন্ধুকে অনশনরত অবস্থায় ফরিদপুর জেলে প্রেরণ করা হল। ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪ টায় ছাত্রদের মিছিলের ওপর মুসলিম লীগ সরকার গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার লুটিয়ে পড়ল কালো পিচঢালা পথে।

রক্তের অক্ষরে মায়ের ভাষায় মাকে মা বলে ডাকার দাবি জানিয়ে গেল। সেই থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রতি বছর 'শহিদ দিবস' হিসেবে পালিত হয়। আমি ও কামাল খুব ছোট্ট। আব্বা প্রায় আড়াই বছর ধরে বন্দি তারপরও খুব অসুস্থ অবস্থায় অনশন করছেন। দাদা এ খবর পেয়ে আমাদের নিয়ে ঢাকায় রওনা হলেন নৌকায় করে। বেশ বড় নৌকায় আমরা দুই ভাই-বোন হেঁটে চলে বেড়াতে পারি। দুই কামরা নৌকায়। টুঙ্গিপাড়া থেকে রওনা হয়ে পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়ালখাঁ পাড়ি দিয়ে চারদিনে ঢাকায় এসে পৌঁছেছি। তিন মাল্লার নৌকা তাই বেশ তাড়াতাড়ি এসেছি। আজিমপুর কলোনিতে আমার দাদার ছোটভাই থাকতেন তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে, আমরা সেখানে উঠলাম। ২১শে ফেব্রুয়ারির দিন আমি তখন ঢাকায় ছিলাম, তবে এত ছোট্ট ছিলাম যে, সব স্মৃতি এখন মনে নেই। রাতে কার্ফু, সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডেকেছে। আজিমপুর কলোনিতে এসে মুখে চোঙা লাগিয়ে কেউ রাতে অফিসে না যায় তার জন্য আহ্বান করত আর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে ধাওয়া করত। ঘরের ভেতর একরকম বন্দি থাকতে হয়েছে। পরের দিন, আব্বার খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল, তাঁকে ফরিদপুর জেলে নিয়ে গেছে। দাদা স্টিমারে মা, দাদি, কামাল ও আমাকে দেশের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। আর দাদা গেলেন ফরিদপুরে। আব্বাকে ফেব্রুয়ারির শেষদিকে মুক্তি দেওয়া হল। অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় দাদা আব্বাকে বাড়ি নিয়ে এলেন। দীর্ঘদিন অনশনে থেকে শরীরের যে ক্ষতি হয়েছিল তা সারিয়ে তুলতে তিন মাস সময় লেগেছিল।

২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের মহৎ অর্জন। এই অর্জনের পেছনে রয়েছে কত আত্মত্যাগ। অনেক অত্যাচার, নির্যাতন স্বীকার করে রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি ভাষার মর্যাদা। আর এই ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই পেয়েছি স্বাধীনতা।

কানাডায় প্রবাসী কয়েকজন বাঙালি এবং কিছু বিদেশি মিলে মাতৃভাষার প্রেমিক গোষ্ঠী নামে একটি সংগঠন করে। এই সংগঠন প্রথম জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' নামে একটি দিবস ঘোষণার প্রস্তাব পাঠায়। চিঠির উত্তরে মহাসচিব জানান, কোনও প্রতিষ্ঠান নয়, জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত কোনও দেশের কাছ থেকে প্রস্তাব এলে তারা বিবেচনা করতে পারে।

কানাডা থেকে শিক্ষামন্ত্রণালয়ে বিষয়টি জানানো হয়। ১৯৯৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর আমাকে ফোনে শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি জানান এবং প্রস্তাব পাঠাতে পারি কিনা তা জানতে চান। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব পাঠাতে বলি। প্রস্তাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে বাঙালির আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করা এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের কথা উল্লেখ করা হয়। ১০ই সেপ্টেম্বর ছিল প্রস্তাব পাঠানোর শেষ দিন। কাজেই অতি দ্রুত শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই প্রস্তাব ইউনেস্কোতে প্রেরণ করে।

১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসাবে পলিত হয় আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিক বিদ্রোহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। শ্রমিকরা শ্রমের মূল্য আদায়ের জন্য জীবন দান করেছিল। সারা বিশ্ব সে দিবসটি পালন করে বিশ্বময়। শিক্ষামন্ত্রীকে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কথাও বলি। ১৭ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিউইয়র্ক যাই। জাতিসংঘে রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন করি। জাতিসংঘের মহাসচিব এবং অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধানদের সাক্ষাৎ হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং মহাসচিবের দেওয়া মধ্যাহ্নভোজে শরিক হই।

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রধানদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালি জাতির অবদানের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরি। মাতৃভাষাকে আমরা কত ভালবাসি তা গর্বভরে উল্লেখ করি।

নিউইয়র্ক থেকে আমি প্যারিস যাই ইউনেস্কো কর্তৃক শান্তি পুরস্কার গ্রহণের জন্য। ২৪শে সেপ্টেম্বর আমাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ইউনেস্কোর প্রধানের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বিষয়ে আলোচনা করি। ২১শে ফেব্রুয়ারির কথা উল্লেখ্য করি।

অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি, ছেলেমেয়েদের নিজের ভাষা না শিখিয়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ইংরেজি অবশ্যই শিখবে, ইংরেজি, আরবি এই দুটো ভাষা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন, বিশেষ করে জীবন-জীবিকার জন্য এ দুটো ভাষার প্রয়োগ জানতে হবে। পাশাপাশি অন্য ভাষাও শিখতে পারি। কিন্তু তা অবশ্যই মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে নয়।

ঢাকা শহরে গুলশান, বারিধারা, বনানীতে ইদানীং দেখা যায় ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল। বাংলা শিক্ষা একেবারে দেওয়া হয় না। প্রতিটি স্কুলে মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। আর একটি বিষয় আমাকে খুবই পীড়া দেয়। সেটা হল ইংরেজি অ্যাকসেন্টে বাংলা বলা।

অর্থশালী, সম্পদশালী পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ প্রবণতা একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। আর যদি হঠাৎ পয়সাওয়ালা হয় তাহলে তো কথাই নেই। মনে হয় বাংলা বলতে যেন খুবই কষ্ট হচ্ছে। এ প্রবণতা কেন? নিজেদের

দৈন্য ঢাকার জন্য ? নাকি যেখানে মৌলিকত্বের অভাব সেখানে শূন্যতা ঢাকার প্রচেষ্টা ? অভিভাবক, শিক্ষক, বিশেষ করে পিতামাতাকে এ বিষয়ে নজর দিতে হবে। বিদেশে বসবাসরত পরিবারগুলো ঘরে বসে বাচ্চাদের সঙ্গে ইংরেজি বলেন। ফলে বাচ্চাদের মাতৃভাষা শেখার আর কোনও সুযোগ থাকে না। দিনের অধিকাংশ সময় বাচ্চারা থাকে না। দিনের অধিকাংশ সময় বাচ্চারা স্কুলে কাটায়। কাজেই যে দেশে থাকে বা যে ভাষায় শিক্ষা নেয় সে ভাষা সহজেই শিখে নেয়। ঘরে এসে যদি মাতৃভাষায় কথা না বলা হয় তাহলে তো মাতৃভাষা শেখবেই না।

বাচ্চাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তাদের শিখিয়ে দিলেই হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে মাতৃভাষা ব্যবহার করাই প্রয়োজন। বাচ্চারা ভাষা খুবই তাড়াতাড়ি রপ্ত করতে পারে। এমনকি একইসঙ্গে অনেকগুলো ভাষা শিখে ফেলে। ওদের কিন্তু তেমন অসুবিধা হয় না।

আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি। স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছি। রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর। বিশ্ব সভায় বাংলা ভাষা মর্যাদা পেয়েছিল। বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। পৃথিবীতে যত ভাষাভাষী রয়েছে বাঙালি জনসংখ্যার দিক দিয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করে আছে। কাজেই আমাদের ভাষা অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী। আমাদের ভাষার চর্চা বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশে আমরা মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করব। এই গবেষণা কেন্দ্রে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংগ্রহ করা হবে। মাতৃভাষা উৎকর্ষ সাধনে গবেষণা করা হবে। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা রাখা হবে। বাংলাদেশের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। পৃথিবীর (১৮৮) একশত অষ্টাশিটা দেশ এখন থেকে মাতৃভাষা দিবস পালন করবে। এই দিবস পালনকালে বাংলাদেশের ভাষাশহিদ রফিক, জব্বার, বরকত, শফিউর, সালামের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। আমাদের সকলের দায়িত্ব বাংলাদেশে আর্য-সামাজিক উন্নতি সাধনে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গ্রহণ করা ২০২০ সালের বাংলাদেশ শিক্ষায়-দীক্ষায় জ্ঞান-গরিমায় উন্নত হবে। অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করে ক্ষুধামুক্ত, শোষণমুক্ত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে উঠবে। ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে সর্বসম্মতিভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও কর্মকর্তারা এবং প্যারিসের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কতর্মকর্তা যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। ১৭ই নভেম্বর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। পৃথিবীতে অসংখ্য জাতি। ছয় হাজারের বেশি মাতৃভাষা রয়েছে। সঠিক সংখ্যাটি এখনও জানা যায়নি। অনেক ভাষা হারিয়ে গেছে। জীবন-জীবিকার খোঁজে মানুষ তার সুবিধামত

অবস্থান নেয় বা নিতে বাধ্য হয়। ফলে সহজে যোগাযোগের মাধ্যম খুঁজে নেয়। আর তাই হারিয়ে যায় মাতৃভাষা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা হওয়াতে আর মাতৃভাষা হারিয়ে যাবে না। অন্তত অস্তিত্বও খুঁজে বের করা যাবে, সংরক্ষণ করা হবে, গবেষণা করা হবে। বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা।

আমাদের আরও যত্নবান হতে হবে আমাদের ভাষাকে বিকশিত করার জন্য, চর্চা, করার জন্য। মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে যত সুন্দর সহজভাবে বিষয়টি আমরা বুঝতে পারি, অন্য কোনও বিজাতীয় ভাষায় কি তা আমরা বুঝতে পারি ? শিক্ষার মাধ্যমে বাংলা হতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার চর্চা করতে হবে। পাশাপশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে অন্য ভাষাও শিখতে হবে।

তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে ছোট হয়ে আসছে বিশ্ব; তাই মানুষে মানুষে যোগযোগও বেড়েছে। জীবন-জীবিকার অন্বেষণে মানুষ ছুটে যাচ্ছে দেশে বিদেশে। তাই মাতৃভাষা পাশাপাশি অন্য ভাষার প্রয়োজন আমরা স্বীকার করি, তার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু তা মাতৃভাষাকে ভুলে নয়। রক্তে কেনা আমাদের মাতৃভাষা, এ ভাষার চর্চার জন্য আমাদের সকলকে যত্নবান হতে হবে। আন্তরিক হতে হবে। বিশ্ব স্বীকৃতি পাওয়ার পর আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। যে মর্যাদা আজ বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ পেয়েছে সে মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে হবে।

পুনর্মুদ্রণ: তহমিনা খাতুন ও প্রবীর দে সম্পাদিত। *মায়ের ভাষা*। ২০০৩। এন.ই. পাবলিশার্স: কলকাতা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে;-
"ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।
(বঙ্গভাষা / মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

যে-প্রাণশক্তি বাঙালির ভাষা চেতনাকে প্রতিরোধ ও আত্মত্যাগের ঐতিহাসিক আন্দোলনে রূপ দিয়েছিল তা ছিল মূলত মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার চেতনা। তৎকালীন পাকিস্তানের বহুভাষিক পরিমণ্ডলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন একদিকে যেমন ছিল নিজ ভাষার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ অন্যদিকে এ আন্দোলনে অন্য ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি অপ্রকাশ্য থাকেনি। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেছিলেন কবি হাসান হাফিজুর রহমান। এটি ছিল অমর একুশের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত প্রথম সংকলন। এ সংকলনে ভূমিকার পরে যে লেখাটি স্থান পেয়েছে তার শিরোনাম 'সকল ভাষার সমান মর্যাদা'। এ যাবত একুশে নিয়ে যত লেখা হয়েছে; কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ; প্রতিটিতে মা, মাতৃভূমি, জাতিসত্তা এবং জনগণের সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নানা অনুষঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। বাঙালির ভাষা চেতনার এই যে সম্প্রসারিত রূপ তা বিশ্বজনীন চেতনারই অংশ। এর ফলে একুশে ফেব্রুয়ারির সুমহান আত্মত্যাগ বিশ্বসভায় স্বীকৃতি পেয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

ভাষা ও মাতৃভাষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষা সম্পর্কে বলেছেন :

> সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে প্রাণগত ও মনোগত মিলনের ও আদানপ্রদানের উপায়স্বরূপ মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতিকে এক করে তুলেছে; নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হত।

রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে মানুষের সৃষ্টি বলে উল্লেখ করলেও ভাষার সৃষ্টি বা উৎপত্তি নিয়ে নানা ব্যাখ্যা আছে; ধর্মীয়, সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। এসব ব্যাখ্যার কোনোটি পরস্পরের পরিপূরক, কোনোটা পরস্পরবিরোধীও বটে। বস্তুত এসব ব্যাখ্যা থেকে মানুষের কথ্য ও লিখিত ভাষার উৎপত্তি নিয়ে সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারিনা। মাটি খুঁড়ে যখন লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বের ফসিল বা প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কার করি, তাতে সভ্যতার অগ্রগমন, মানব-সমাজ, জাতি ও প্রজাতির উদ্ভব, এসবের অনেক সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়; কিন্তু আমাদের দূরবর্তী পূর্বপুরুষেরা কীভাবে কথা বলত তা অনুমান করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বাইবেলে আছে, সৃষ্টিকর্তা আদমকে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন বৃক্ষরাজি ও পশুপাখি। আদম প্রভুর সৃষ্টিকে যেভাবে ডেকেছেন তা থেকেই ভাষার উৎপত্তি। গ্রিক পুরাণ অনুসারে দেবতা হার্মিস থেকে এবং হিন্দু পুরাণ অনুসারে দেবী সরস্বতী থেকে ভাষার উৎপত্তি। এ প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক গবেষণার কথা আমরা হেরোডেটাস-এর কাছ থেকে জানতে পারি। দু'জন নবজাতককে নিয়ে একজন মিসরীয় ফারাও খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে এ গবেষণা করেছিলেন। ভেড়া ও বোবা রাখালের সঙ্গে দু-বছর থাকার পর এই শিশুরা প্রথম স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে শব্দ উচ্চারণ করেছিল তা কোনো মিশরীয় শব্দ ছিল না। তারা bekos নামক একটি শব্দ উচ্চারণ করেছিল যার অর্থ রুটি। এটি ছিল প্রাচীন আনাতোলিয়া অঞ্চলের ফ্রিজীয় (phrygian) শব্দ। এ থেকে ফারাও এ ধারণা করেছিলেন যে, ফ্রিজীয় ভাষাই আদি ভাষা। তবে এ ব্যাখ্যা অনুমাননির্ভর বলে ধোপে টেকেনি। পরবর্তীকালে দেখা গেছে, যে শিশুরা মানুষের সংস্পর্শে আসেনি, তারা কোনো ভাষা ব্যবহার করতে শেখেনি। অন্য একটি ব্যাখ্যায় প্রাকৃতিক ধ্বনি (Natural Sound) বা আওয়াজ (noise) - এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে অনুমান হচ্ছে যে, প্রাচীন মানুষ প্রথমে তাদের চারপাশের প্রাকৃতিক ধ্বনি বা আওয়াজকে অনুকরণ করে ভাষা শিখেছে।

ভাষার উৎপত্তি নিয়ে নানা ব্যাখ্যা থাকলেও এটি ধারণা করা যায় যে, প্রাচীন মানুষের পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান ও যোগাযোগের বাহন হিসেবে ভাষার শুরু হয়েছে। এর সঙ্গে মানব মস্তিষ্কের সক্ষমতা, সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার বিষয় সম্পর্কযুক্ত; বিধায় অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে মানবভাষা মৌলিকভাবে ভিন্ন। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভাষার উৎপত্তি একদিনে হয়নি; মানব বিবর্তনের পথেই ভাষা ক্রমান্বয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিবর্তনবাদীদের মতে, মস্তিষ্কের যে প্লেটটি ভাষার উপস্থিতি নির্দেশ করে, তা প্রথম দেখা যায়, Australoppithecine-এর ফসিলের মধ্যে ২.৫ মিলিয়ন বা ২৫ লক্ষ বছর আগে। ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনের ধারায় দেখা যায় যে, হোমোইরেকটাস থেকে হোমোসেপিয়েন্স–নিয়ান্ডারথালেনসিস এবং সেখান থেকে Sapience Sapiens, পরবর্তী সময়ে ক্রো ম্যাগনন, সেখান থেকে আধুনিক মানুষ। এই দীর্ঘযাত্রায় ভাষার উপস্থিতি সকল ক্ষেত্রে দেখা যায়। এভাবে পরিবর্তন এবং বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভাষা হয়েছে বিবর্তিত।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর। তাঁর মতে, ভাষা একটি স্বৈচ্ছক (Arbitrary) প্রতীক (Sign) ব্যবস্থা, যেখানে চিহ্নগুলি

হলো শব্দ। ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি ভাষার কাঠামোকে দুটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত করেছেন: একটি হলো শব্দব্যবস্থা, অন্যটি বাগর্থব্যবস্থা (System of meaning)। তাত্ত্বিক এবং প্রত্যয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, ভাষা কেবল মানুষেরই আছে। তবে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, প্রাণিকুল প্রতীকের ব্যবহার করে, যা শব্দের মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়। কিন্তু তা ভাষা নয়, কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতীকী চিহ্নের সঙ্গে অর্থের সম্পৃক্ততা না থাকবে এবং যে শুনবে সে সম্পৃক্ত অর্থকে অনুধাবন করতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ভাষা বলে পরিগণিত হবে না।

মাতৃভাষা বলতে আমরা সাধারণ অর্থে মায়ের ভাষাকে বুঝি। তবে এর অর্থ শুধুমাত্র মায়ের ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাপক অর্থে একটি জাতিগোষ্ঠীর ভাষাই মাতৃভাষা। অনেক ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে শিশুর প্রথম ভাষা (First Language) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ জন্মের পর শিশু মাতা-পিতার কাছ থেকে এ ভাষা শেখে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ রয়েছে। তাদের মাতৃভাষাও বিভিন্ন। বহুভাষিক পরিমণ্ডলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুর সামাজিক ভাষাতাত্ত্বিক পরিচিতি তৈরি হয়।

ভাষা জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। ভাষার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য সুনির্দিষ্ট হয়। এজন্য মাতৃভাষার প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটি এসে পড়ে। তবে সকল ক্ষেত্রে মাতৃভাষা বলতে মায়ের ভাষা বোঝায় না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিয়ের পর স্ত্রী স্বামীর অনুগামী হয় বিধায় শিশুর প্রথম ভাষা মায়ের ভাষার চেয়ে ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন হতে পারে। একইভাবে মাতৃসূত্রীয় সমাজে শিশুর ভাষা পিতার ভাষার চেয়ে ভিন্ন হতে পারে।

সেজন্য মাতৃভাষাকে শুধুমাত্র প্রথম ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা সংগত হবে না। জাতীয় ঐক্য ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের নিরিখে মাতৃভাষাকে বিবেচনায় আনতে হবে। সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তাগিদ থেকেই ১৯৫২ সালে 'বাঙালির প্রাণমন আত্মার সুপ্তিভঙ্গ' ঘটেছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল। যার ধারাবাহিকতায় আন্দোলন ও সংগ্রামের ঐতিহাসিক পথপরিক্রমায় ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরণীয় নেতৃত্বে অভ্যুদয় ঘটে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের।

বিলুপ্তি, মৃত ও বিপন্ন ভাষা

পৃথিবীতে বর্তমানে জীবিত ভাষার সংখ্যা কয়টি এ নিয়ে মতান্তর আছে। ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত সূত্রে জানা যায় যে বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৭০০০ ভাষা আছে। এর মধ্যে সকল ভাষার লিখিত রূপ নেই। তাছাড়াও এগুলির মধ্যে ৯০% ভাষায় ১ লক্ষেরও কম মানুষ কথা বলে। পৃথিবীর অনেক ভাষা এখন বিলুপ্ত। অনেকগুলি মৃত, অনেক ভাষা বিপন্ন, অধিকন্তু অনেক ভাষার রূপ বিশ্বায়ন ও প্রভাবশালী ভাষার কারণে ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। কিছু ভাষার কথ্যরূপ টিকে থাকলেও লিখিত বর্ণমালার রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে। কিছু ভাষা Language base বা ভাষা ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, যেমন: প্রাচীন গ্রিক, ল্যাটিন, পালি ও সংস্কৃত ভাষা। এ ভাষাগুলি বর্তমানে সক্রিয় না থাকলেও এসব ভাষার ভিত্তিতে উদ্ভব হয়েছে অনেক ভাষা পরিবার, যেমন ইন্দো-ইউরোপীয়, Ultai Seltic, Urral, Slavec, Mon-khamerian ভাষা। এইসব ভাষা পরিবার থেকে উদ্ভূত হয়ে বিস্তৃত হয়েছে ভাষার শাখাসমূহ যেমন: সংস্কৃত থেকে বাংলা, হিন্দি, সিংহলিজ, বিহারি , উর্দু; পালি থেকে তামিল, তেলেগু, মালায়ালম, কানারা প্রভৃতি ভাষা। পরবর্তীকালে প্রতিটি শাখা আবার রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে গেছে, যেমন চর্যাপদ থেকে আধুনিক বাংলা ভাষা।

ধারণা করা হয় যে, আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বর্তমানে কথ্য ৯০% ভাষা বিলুপ্ত হবে। বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবে অনেক ভাষা বিপন্ন হয়ে পড়বে এবং অচিরেই বিলুপ্ত হবে। বিলুপ্ত ভাষা আমরা তাকেই বলি যে ভাষায় এখন কেউ কথা বলে না। উদাহরণস্বরূপ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে Native American Language-এর স্থান ইংরেজি, ফরাসি, পোর্তুগিজ ও স্প্যানিশ ভাষা দখল করেছে। অন্য দিকে যে ভাষাকে আমরা মৃত ভাষা (যেমন প্রাচীন গ্রিক, আবেস্তীয়, কপটিক, বিবলিকাল হিব্রু, ল্যাটিন, সংস্কৃত) বলি সেগুলির ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক বা আইনগত ব্যবহার আছে। তবে সাধারণ জনগণের মধ্যে সেগুলি প্রচলিত নয়। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী Wade Davis (2009) আধুনিকতা ও বিশ্বায়নের হুমকির কারণে সারা পৃথিবীতে আদিসংস্কৃতি ও ভাষার বিপন্নতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ভাষা বিলুপ্ত হয়ে পড়ার অর্থ হচ্ছে মানুষের সার্বিক কল্পনাশক্তি হ্রাস পাওয়া। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার বিলুপ্তি কিংবা বিপন্ন হওয়ার পেছনে অনেক কারণ আছে। একটি প্রধান কারণ হলো পরিকল্পিতভাবে ভাষা হত্যার চেষ্টা। এটি গণহত্যার মাধ্যমেও হতে পারে কিংবা অন্য ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার মাধ্যমেও হতে পারে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ দুটো ধারণাই প্রাসঙ্গিক। কারণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, অন্যদিকে তারা এ জন্য গণহত্যাও সংঘটিত করেছে। তবে বাঙালির সাহস ও আত্মত্যাগ এ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। কিন্তু পৃথিবীতে বহু দেশে ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে ভাষা-হত্যা বা লিঙ্গুইসাইড (Linguicide) ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের অনেক উদাহরণ আছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকেও অধিকাংশ ইউচি তাদের ভাষায় কথা বলতে পারত। তখন সরকারি স্কুলগুলোতে আমেরিকান ইন্ডিয়ান যারা নিজেদের ভাষায় কথা বলত তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হত। এ অবস্থায় ইউচি ও অন্য ইন্ডিয়ানরা তাদের নিজেদের ভাষাকে বাদ দিয়ে ইংরেজি শিখতে বাধ্য হয়। এসব ইন্ডিয়ান জাতিগোষ্ঠীকে 'সভ্য' করার জন্য বিভিন্ন স্কুল ও সংরক্ষিত এলাকায় পাঠানো হত। ফলে তারা তাদের ধর্ম, ভাষা, প্রাচীন বিশ্বাস বাদ দিতে বাধ্য হয়েছে। এভাবে ঔপনিবেশিক শক্তির অত্যাচারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদিবাসীদের অনেক ভাষা হারিয়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে অস্ট্রেলিয়ার তাসমেনিয়ার আদি অধিবাসীদের ভাষাও হারিয়ে গেছে। সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণেও ভাষা বিলুপ্ত হতে পারে। অনেক সময় সমাজে টিকে থাকার জন্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যরা প্রভাবশালী সংস্কৃতি বা ভাষার কাছে নিজেদের সমর্পণ করে।

যে-ভাষার উপযোগিতা বেশি বলে মনে হয় বা যে ভাষায় কথা বলাটা সম্মানের মনে করে, সে-ভাষাকে গ্রহণের মাধ্যমে তারা তাদের নিজস্ব ভাষাকে ভুলে যায়– এই আত্তীকরণ

(Assimilation) প্রক্রিয়া কখনো স্বেচ্ছাকৃত, কখনো জোরপূর্বকও হতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশে ভাষা পুনরুজ্জীবন বা Revitalization-এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় অনেক মৃতভাষা পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ হিব্রু, আইরিশ, ওয়েলস ভাষার পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ার কথা বলা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একীভূত হওয়ার পর হাওয়াইন ভাষাকে নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে এ ভাষা পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা

বাংলাদেশে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অনেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস এই অঞ্চলে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এসব জাতিগোষ্ঠী নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে লেখালেখি হলেও সামগ্রিকভাবে কোনো নৃতাত্ত্বিক গবেষণা হয়নি। ফলে এদের সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য আছে। বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত সেন্সাস রিপোর্ট ও গবেষণাপত্রে সংখ্যার এ ভিন্নতা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ পিটার বার্টেচি (১৯৮৪) এদর সংখ্যা ১২ বলে উল্লেখ করেছেন। এ জি সামাদ (১৯৮৪) ১৫ বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৯১ সালের সেন্সাসে এদের সংখ্যা ২৯ বলে উল্লেখ আছে। তবে কিবরিয়া-উল-খালেকের (১৯৯৫) মতে, এ সংখ্যা ২৪ এর উপরে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির Indigenous Communities গ্রন্থেও ৪৫টি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। সৌরভ (২০১০) বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও ৪৫টি নৃ-গোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন। তার মতে, এরা পৃথিবীর প্রধান ৪টি ভাষা পরিবারের (অস্ট্রো-এশিয়াটিক, চীনা-তিব্বতি, দ্রাবিড়, ইন্দো-ইউরোপীয়) ৩০টি ভাষা ব্যবহার করে। এর মধ্যে কিছু ভাষাকে উপভাষা হিসাবে (যেমন: রাখাইন, তঞ্চঙ্গা, হাজং ইত্যাদি) উল্লেখ করে তিনি আদিবাসী ভাষার সংখ্যা ২৬টি বলে মত দিয়েছেন। বাংলাভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে এসব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রধানত চীনা-তিব্বতি বা তিব্বতি–বর্মি ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত (যেমন: গারো, ককবোরক, কোচ, রাজবংশী, মনিপুরী ইত্যাদি)। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবে তাদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারভুক্ত বলে ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন। বাংলাদেশ অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খাসিয়া, সাঁওতালি ও মুণ্ডা ভাষা। খাসিয়া ভাষার নিজস্ব কোন বর্ণমালা নেই। বর্তমানে রোমান হরফে এ ভাষা লেখা হচ্ছে। তেমনি সাঁওতালি ভাষা ও মুণ্ডা ভাষারও নিজস্ব বর্ণমালা নেই। বর্তমানে রোমান হরফে এ ভাষা লেখা হচ্ছে। বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে বসবাসকারী গারো বা মান্দিরা 'আচিক' ভাষায় কথা বলে। এদেশের আলাদা আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে, তবে এ ভাষারও নিজস্ব বর্ণমালা নেই। বর্তমানে এ ভাষার লিখিত রূপে রোমান ও সীমিত পর্যায়ে বাংলা ব্যবহার হচ্ছে। তবে ভারতের মেঘালয়ে গারোরা নিজ ভাষাতে লেখাপড়া করছে। কোচ ও রাজবংশিদেরও নিজস্ব লিপি নেই। বাংলাদেশে দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের একমাত্র সদস্য ওরাঁও বা কুড়ুখ ভাষা। এদেরও কোনো বর্ণমালা নেই। এসব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে কয়েকটি ভাষা বর্তমানে বিলুপ্তির পথে যেমন– খুমি, পাংখোয়া, ঠার ইত্যাদি। এসব নৃ-গোষ্ঠী, যাদের নিজস্ব বর্ণমালা নেই তারা বর্তমানে রোমান হরফ ব্যবহার করছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলা হরফে তাদের ভাষা লেখা হচ্ছে। তবে কিছু কিছু জনগোষ্ঠী তাদের ভাষাকে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলা বা রোমান হরফে তাদের ভাষা শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে। চাকমা, গারো, ককবোরক, বিষ্ণুপ্রিয় মনিপুরি, রাখাইন ইত্যাদি ভাষায় বর্তমানে উন্নতমানের সাহিত্যও রচিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপট ও বর্তমান প্রত্যাশা

২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার লক্ষ্যে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষা প্রেমিকগোষ্ঠী। তাদের এ উদ্যোগ ও প্রচেষ্ঠাকে সফল করার জন্য তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে এতদসংক্রান্ত সরকারি প্রস্তাব ইউনেস্কো সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। এজন্য তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ কে সাদেকের নেতৃত্বে ০৭ সদস্যের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এর ফলে ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর মর্যাদা লাভ করে। ইউনেস্কো সাধারণ পরিষদে গৃহীত এতদসংক্রান্ত প্রস্তাবনায় বলা হয়:

30 C/DR. page 2

Bearing in mind also that all moves to promote the dissemination of mother tongues will serve not only to encourage linguistic diversity and multilingual education but also to development of fuller awareness of linguistic and cultural traditions throughout the world and to inspire solidarity based on understanding, tolerance and dialogue.

Considering consequently that one of the most effective ways to promote and develop mother tongues is the establishment of an "International Mother Language Day" With a view to organizing various activities in the Member States and an exhibition at UNESCO Headquarters on that same day.

Recognizing the unprecedented sacrifice made by Bangladesh for the cause of mother language on 21 February 1952.

Noting that this idea has not yet been adopted at the international level. Proposes that 21 February be proclaimed 'International Mother Language Day' Throughout the world to commemorate the martyrs who sacrificed their lives on this very date in 1952.

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' আজ পৃথিবীর সকল দেশ ও জনগোষ্ঠীর কাছে নতুন অঙ্গীকারের বার্তা নিয়ে এসেছে। প্রতি বছর এ দিবসটি উদ্‌যাপন করার মাধ্যমে ভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের স্মৃতি তর্পণের পাশাপাশি সকল রাষ্ট্র বিভিন্ন জাতিসত্তা ও ভাষা সংরক্ষণের প্রত্যয় ব্যক্ত করে। এ জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগও শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বের সকল ভাষার নমুনা সংরক্ষণ ও মৃত বা বিলুপ্তপ্রায় ভাষার পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টায় নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ ইনস্টিটিউট বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন

অবদান রাখবে তেমনি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। মায়ের ভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার সুযোগ তৈরি করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। মাতৃভাষার ইতিহাস, ঐতিহ্য, লিপি এবং কথ্য ও লিখিত রূপ সম্পর্কে জানতে পারলে বিশ্বায়নের প্রবল স্রোতেরও মানুষ শেকড়চ্যুত হবে না বরং নিজস্ব সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে।

বর্তমান সরকার প্রণীত শিক্ষানীতি ২০১০-এ দেশের ক্ষুদ্র জাতিসমূহের সংস্কৃতি ও ভাষা বিকাশে সহায়তা প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেজন্য শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা, আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা, যেসব আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথাও শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ২৮ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। আজ বিশ্বায়ন ও আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলা ভাষাও বিপন্ন প্রায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে বিশ্বসভায় বাংলা ও বাঙালির জন্য সূচনা করেছিলেন অবিস্মরণীয় এক ইতিহাসের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৪তম অধিবেশনে বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করে বাংলা ভাষার মর্যাদা সমুন্নত করার উদ্যোগে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি বাংলা ভাষা। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির যে ঐক্য তা বাংলা ভাষার মাধ্যমেই প্রবাহিত। এ ভাষায় রয়েছে বিশ্বমানের অসামান্য অনেক সাহিত্যস্রষ্টা সেই বাংলা ভাষা আজ স্বদেশে যেন পরবাসী। আজ বাংলাদেশে অফিস দোকান-পাট সর্বত্র ইংরেজি দৃশ্যমান। সেমিনার, অনুষ্ঠানে অপ্রয়োজনে ইংরেজির ব্যবহার বাড়ছে। অন্যদিকে আকাশ সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাবে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে বাংলা ভাষা। আমরা ইংরেজি বাংলার মিশেলে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, এফএম রেডিওতে জগাখিচুড়ি এক ভাষা ব্যবহার করছি। উপস্থাপক 'নাউ একটি ছং বলব'–এ ধরনের বিকৃতভাষা ব্যবহার করছেন যাকে বাংলিশও বলা যাবে না। তাতে দুষ্ট হচ্ছে আমাদের মহান ভাষা, দুষ্ট হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষাও।

পাকিস্তান আমলে একসময় আরবি ও পরবর্তী সময়ে রোমান হরফে বাংলা প্রচলনের চেষ্টা হয়েছিল। বাঙালির প্রতিবাদের মুখে এ প্রচেষ্টা বেশিদূর এগোয়নি। আজ দেখা যাচ্ছে মোবাইল ফোনে, ই-মেইলে হরদম আমরা রোমান হরফ ব্যবহার করছি। এভাবে বাংলাভাষায় লিখিত রূপও পরিবর্তিত হচ্ছে। আমরা ভুলে যাচ্ছি শুদ্ধ বানান ও বাক্যগঠন। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলা ভাষাকে তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্পকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে বিভিন্ন খাতে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলা ভাষাকে প্রমিতকরণের জন্য কম্পিউটারে ইউনিকোড ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ গত বছর ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের সদস্য হয়েছে। এখন প্রয়োজন ইউনিকোড ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান, সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার সহজলভ্য করা জরুরি। তবে মোবাইল ফোনকে এখনো ইউনিকোডের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। এ লক্ষ্যে কাজ চলছে। আশা করি আগামীতে আমরা ই-মেইল ও মোবাইল ফোনে বাংলা ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে ভিন্ন হরফে বাংলা লেখা থেকে মুক্ত হতে পারব।

ভাষা স্থবির নয়, ভাষা পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনের স্রোতে ভাষা গ্রহণ করে, বর্জনও করে। ভাষার এ অন্তর্নিহিত শক্তিই ভাষার শুদ্ধতা রক্ষা করে। এভাবেই ভাষা তার স্বাধীনতা বজায় রাখে। আজকের দিনে ভাষা বৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি মাতৃভাষায় শুদ্ধতা ও মর্যাদা রক্ষা করার নব অঙ্গীকারের মধ্যেই মাতৃভাষা দিবসের প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত। আমি শেষ করছি নোবেল বিজয়ী পোলিশ কবি চেশোয়াভ মিউজ এর My Faithful Mother Tongue কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে;

Faithful mother tongue,
perhaps after all it's I who must try to save you.
So I will continue to set before you little bowls of colors
bright and pure if possible,
for what is needed in misfortune is a little order and beauty.

বিশ্বস্ত মাতৃভাষা
সম্ভবত শেষাবধি আমাকেই চেষ্টা করতে হবে
তোমাকে বাঁচানোর জন্য
তাই আমি উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ রঙের ছোট ছোট পাত্র নিয়ে
তোমার সামনে বসে থাকবো
কারণ দুর্ভাগ্যেও আমাদের প্রয়োজন সামান্য শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য।
(চেশোয়াভ মিউজ/মাই ফেইথফুল মাদার টাং)

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলা-ভাষা পরিচয়': রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভাতী, কলিকাতা।
২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), ১৯৫৩,২০০১: একুশে ফেব্রুয়ারী; সময় প্রকাশন, ঢাকা।
৩. সুকুমার সেন, ১৯৯৩ : ভাষার ইতিবৃত্ত; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
৪. শিশিরকুমার দাশ, ১৯৯২: ভাষা জিজ্ঞাসা; প্যাপিরাস, কলকাতা।
৫. ড. সৌরভ সিকদার, ২০১০: বাংলাদেশের আদিবাসী ও আদিবাসী ভাষা (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১১ স্মরণিকায় প্রকাশিত)।
৬. ভেলাম ভান সেন্দেল ও এলেন বল (সম্পাদিত), ১৯৯৮: বাংলার বহুজাতি: বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ। নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।
৭. George Yule, 2002: The Study of Language; Cambridge University Press, U.K.
৮. Qureshi, M.S. (ed), 1984 : Tribal Culture in Bangladesh; IBS Rajshahi University.
৯. Dr. Kamal Abdul Naser Chowdhury, 2006 : Residence, Gender & Power in Garo Society of Bangladesh (Unpublished Ph.D. Dissertation), DU.
১০.Kibriaul Khaleque 1995 : "Bangladesh, Land, Forest and Forest People". Ethnic Communities of Bangladesh in Philip Gain (ed) SEHD, Dhaka.

Amar Ekushey, the International Mother Language Day

Mohit Ul Alam

In the Thursday afternoon of 21st February 1952 the police started the firing to disperse the protesting crowd at 3 o'clock in front of Dhaka Medical College. A memorable black and white picture by Amanul Haq shows the splattered brain of Rafiquddin on the road, one of the four persons killed on that day. The other three were Jabbar, Barakat and Salam. And on the following day another person by the name of Shafiur would die. These five people and three more are the martyrs who lost their lives for defending the rights of their mother tongue—Bengali (Bangla). But, translated into political reality, it is because of their embracing of the martyrdom that Bangladesh came into being.

The movement that culminated on 21st February 1952 in the death of the above martyrs goes in history as the Language Movement, which actually started to take momentum with the birth of Pakistan in 1947. The demand for Bangla to be one of the state languages of Pakistan was raised in the first meeting of the Constituent Assembly of Pakistan held in February 1948 in Karachi by Sri Dhirendranath Datta, an elected member from Comilla. The then Prime Minister of Pakistan Nawabjada Liakat Ali Khan protested against it saying that ten crores of people in India spoke Urdu. Mr Datta replied that the language of the majority of people in Pakistan was Bangla.

When the news of the denial of Bangla as a state language reached East Pakistan there was high reaction, and in Dhaka meetings were held and processions led almost every day at the Arts Faculty of Dhaka University. In the wake of such agitation Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, came to Dhaka in 1948 and addressed a public gathering at the Race Course on 21st March, where, upon the language question, he unambiguously declared that "Only Urdu, and Urdu shall be the state language of Pakistan." People present in the meeting uttered "No" in defiance. But Jinnah was not to be deterred, and on 24th March at the Convocation Ceremony of the Dhaka University in the Curzon Hall he again determinedly said that Urdu would be the only state language of Pakistan. He went on to say, "there could be only one state language in a country . . . and then that language in my opinion, will have to be Urdu." The leaders of the Language Movement, Shamsul Huq, Kamruddin Ahmed, Abul Kashem, Tajuddin Ahmed, Naimuddin Ahmed, Shamsul Alam, Syed Nazrul Islam and Oli Ahad formed a delegation to meet Jinnah on the language issue, but Jinnah rejected their demand too. Between 1948 and 1951, every year on March 11 the Language Day was observed but in 1952 things took a sharp turn when Khawaja Nazimuddin, who was also the Prime Minister of East Bengal during the Language Movement in 1948, pronounced in his presidential address at a convention of the All Pakistan Muslim League on 26 January 1952 that Urdu should be the only state language of Pakistan. The student community of Dhaka broke into protest and the All Party Student Action Committee was reconstituted and the 30th January was declared as the Protest day. Subsequently, on 4th February in a meeting at the old Arts Faculty building of Dhaka University it was decided that the 21st February would be observed as the State Language Day.

II

Not only during the early period of Pakistan that Bangla found itself in a challenging position to gain status as an official language, there had been moments in the past when poets, writers and thinkers expressed both their disappointment and hope: disappointment at the denial of Bangla to be the people's language, and hopes that one day its rights would be established. Poet Abdul Hakim wondered in the seventeenth century that those who were born in Bengal but hated their mother tongue, Bangla, why they would not leave their country. In the nineteenth century, Michael Modhusudhon Datta, who at first composed poetry in English abandoned it altogether and recorded his feelings about this transition in a famous poem, titled "Bangobhasha," where he rues the fact that he had been so far such a dullard as to be greedy for others' assets neglecting the gems of his own language.

Legendary writer Syed Mujtaba Ali in his essay, "Ingreji bonam matribhasha," (English versus the mother tongue) takes issue with Sir Jodunath Sarker, who wrote in an article in *The Hindustan Standard* that for the greater India it is not Hindi but English which should be the lingua franca. Ali argues that people cannot become absolute bi-linguists, except for the 'golams' (servants). . . . . But my son isn't a golam, and I hope one day he'll study even science in Bangla. If my son can't do it, but your son does it, I'll be happy" (translation mine).

Dr. Muhammad Shahidullah who was the first to realize the non-communal characteristics of the Bengali Language said in the First Literary Convention of East Pakistan held in 1948 that "It's true that we are Hindus or Muslims, but the greater truth is that we are Bengalis (Bangali). It's not a matter of ideology, it's a reality. Mother Nature has imprinted the Bangali-ness so firmly on our faces and language that strings of beads, rosary and sandalwood paste on the forehead or the beard, tupi (cap) or lungi cannot hide the facts" (translation mine).

III

The Pakistan resolution was passed in Lahore at the All India Muslim League Convention in 1940, and it was a Bengali leader, Sher-e-Bangla AK Fazlul Haque, the Chief Minister of undivided Bengal, who launched the proposal for a separate state for Muslims in India. That is, the Pakistan Resolution upheld Jinnah's two-nation theory that defined the state (Pakistan) on the basis of communal segregation. Political history cannot be made without irony. The ironical part behind the creation of Pakistan is that though the Muslim leadership from the then East Bengal desired earnestly to have the state created, soon after the independence it took no time for them to realize that their dreams were to be shattered.

As the Language Movement was going on, what became clearer at the same time was that politically and economically East Pakistan was being gradually subjugated by West Pakistan. In a way it was only a question of time that the rights for the mother tongue were also converging on seeking political and economic autonomy for East Pakistan. Sooner than later the language question became a political question, and the Muslim League government found it difficult to rule by the communal ideology embodied in Jinnah's two-nation theory, by which the people of East Pakistan were discriminated on their language and nationality. At this point a national election was held in 1954, in which the United Front won overwhelmingly against the ruling Muslim League. At that time the Awami League, under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman (later to become Bangabandhu—"Friend of Bengal") was agitating for the rights of the Bangla Language and Bengalis. When the agenda for dissolution of provinces for an amalgamated West Pakistan and East Pakistan with a strong central government was tabled at a meeting of the Constituent Assembly, Mujib vehemently rejected it as he clearly saw it as another ploy to suppress the demand for autonomy of East Bengal (East Pakistan). He said in a speech: "Sir [President of the Constituent Assembly], you will see that they want to replace the word 'East Bengal' with 'East Pakistan'. We had demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted."

However, the 1956 constitution was abrogated by the then President of Pakistan, Iskander Mirza and the martial law was clamped on October 7, 1958 with Army Chief of Staff, General Ayub Khan as the Chief Martial Law Administrator, who soon, however, ousted Mirza and became the President himself. Ayub Khan ruled Pakistan for ten years, but the political unrest continued in East Pakistan and under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman the movement for autonomy of East Pakistan gained momentum. In 1966 Sheikh Mujibur Rahman placed his famous 6-point demand, called "Our Charter of Survival" at a national conference of opposition political parties at Lahore, which to all purposes was a nationalist demand from the Bengal leader, and which sought provincial autonomy in finance, currency, communications and other important sectors, except for defense and foreign relations. Citing the economic differences between the two wings of Pakistan, Mujib showed that while 71% of the national expenditures were made for the 36% of population of the West Pakistan, for the majority 64% of people of East Pakistan only 29% of the national budget was spent.

The 6-point demand was virtually a manifesto of the Independent Bangladesh, and, as a counter-move by the Pakistan government, repression on Bangabandhu and his party, the Awami League was intensified. Bangabandhu was imprisoned a number of times, and a fake secessionist case, known as the infamous Agartala Conspiracy Case was filed against him. But no proof could be produced, and the wave of support for him by now was enormous and people led processions, battled the police, and defied Section 144 and the curfew on one point--bringing Mujib out of jail.

After he was released, Mujib made a declaration at a public meeting on December 5, 1969 held to observe the death anniversary of Suhrawardy that henceforth East Pakistan would be called "Bangladesh": "There was a time when all efforts were made to erase the word 'Bangla' from this land and its map. The existence of the word 'Bangla' was found nowhere except in the term Bay of Bengal. I, on behalf of Pakistan, announce today that this land will be called 'Bangladesh' instead of East Pakistan."

In the national election of 1970 the Awami League won with a resounding victory, capturing majority seats. But the Pakistan government would not hand over the power to the Awami League, and President Yahiya Khan, who announced that the parliament would sit in its first session on 3rd March 1971 now suddenly postponed the session on 1st March, at which the whole of East Pakistan erupted like a volcano, and Mujib declared the Independence of Bangladesh on the midnight of 26th March 1971, just when the Pakistan military junta started the most heinous genocidal operation, known as the Operation Searchlight, on the unarmed Bengalis. Mujib was arrested and flown to West Pakistan.

IV

After analyzing the inseparability between the Language Movement and the birth of Bangladesh, a word now can be said with regard to Amar Ekushey (the Immortal 21st February, which has gained the status of the International Mother Language Day.

We fought for our mother tongue, which is now being recognized as the liberating mode for all the mother ongues of the world. From a mother's perspective, it is like viewing her own baby as playing a steering role for all babies of all mothers. Her baby, therefore, tbecomes partly unfamiliar to her, partly strange, as

This was the intellectual impetus that made the Language Movement happen. the baby has taken on the traits and qualities of other babies.

Greater status of our mother tongue has thrust greater responsibility on us, the citizens of the only country which has Bangla as its official language. This newly-thrust expanded responsibility requires of us to revise our attitude to Bangla.

The first realization is that Bangla probably cannot be demanded to be the language to be established in all spheres of life. The baby's mother would surely go through a sense of loss as she recognizes that her baby is not anymore absolutely hers. A degree of sacrifice--arising out of the sense that something you loved, you considered only as yours, which has been close to your heart, has to be uprooted--is involved in any recognition of the need to perform a greater role. Such is the pain we must bear with if we want to allow our mother tongue a global role to play.

Ernest Renan, the French new-critic, said, it is neither race, nor geography, nor religion, nor language that defines a nation, it is rather a comprehensive consent to live together as a nation given by all differing cultures, languages and religions that gives the identity to a nation.

Bangladesh is an absolutely mono-language country. No sector of activity—politics, education, commerce or jurisprudence is there where Bangla cannot work as the medium of communication on the spoken level provided foreigners are not involved.

Still then, the emergence of Bangladesh over the recent years as a small but potential country is bringing it closer to international forums and diplomatic and cultural sectors and trading zones that make the use of English imperative for it. This may be a critical choice seen from an absolutist point of view, but for Bangladesh to become a modern progressive country, its strength will have to be reflected in the prioritization of its foreign language use.

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সৌরভ সিকদার

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ইউনেস্কোর ৩০তম অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফলে পৃথিবীর সকল ভাষা-ভাষীদের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য দিবস হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষা লাভ করে বিশেষ মর্যাদা। ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে পৃথিবীর ১৮৮টি দেশে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভের নেপথ্যের ইতিহাস জানতে হলে আমাদেরকে একটু পেছনে ফিরে তাকাতে হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনের দিন হিসেবে প্রতিবছরই যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং ১৯৯২ সাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্য 'বাংলা ভাষা দিবস' হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারি পালন করে আসছে।

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করার আগে দিনটি মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে দাবি ওঠে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে। ১৯৯৭ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার গফরগাঁওয়ের 'গফরগাঁও থিয়েটার' একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দানের দাবি। ১৯৯৯ সালে তারা 'অর্ঘ' নামের সংকলনের প্রচ্ছদে প্রথম লেখা হয় :

বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস চাই
একুশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চাই।।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৫২ সালের ভাষাশহীদ আবদুল জব্বারের জন্ম হয়েছিল গফরগাঁয়ে।

১৯৯৯ সালের ৩০ নভেম্বর জাতীয় ইংরেজি দৈনিক *বাংলাদেশ অবজারভার*-এ একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। পত্রলেখক চুয়াডাঙ্গার পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী এম ইমামুল হক। তিনি ১৯৯৮ সালের ২৫ মার্চ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে লিখিত পত্রে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মর্যাদাদানের আহ্বান জানান। এগুলি ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ। এ বিষয়ে প্রথম সফল উদ্যোক্তারা হলেন কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষা-প্রেমিক গোষ্ঠী। এ গোষ্ঠী প্রথমে ১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চ জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' নামে একটি দিবস ঘোষণার প্রস্তাব করে বলে :

The Bangalis have played very important role in protection their Mother Language from serious crisis related to its existence. In today's world there are

many Nations and/or Communities still facing serious crisis and threat against their Mother Languages.

মাতৃভাষা-প্রেমিক গোষ্ঠীর এ চিঠিতে স্বাক্ষর করেন সাত জাতি ও সাত ভাষার দশজন সদস্য। তাঁরা হলেন অ্যালবার্ট ভিনজন ও কারমেন ক্রিস্টোবাল (ফিলিপিনো), জ্যাসন মোরিন ও সুসান হজিন্স (ইংরেজি), ড. কেলভিন চাও (ক্যান্টনিজ), নাজনীন ইসলাম (কা-চি), রেনাটে মার্টিনস (জার্মান), করুণা জোসি (হিন্দি) এবং রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম (বাংলা)। জাতিসংঘ মহাসচিবের দপ্তর থেকে এই গোষ্ঠী বা উদ্যোক্তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, এজন্য নিউইয়র্কে নয়, যোগাযোগ করতে হবে প্যারিসে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-বিষয়ক সংগঠন ইউনেস্কোর সঙ্গে। জাতিসংঘের কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তা হাসান ফেরদৌসেরও এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা ও অবদান রয়েছে।

এরপর প্রায় একবছর পার হয়। ইউনেস্কো কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। কানাডা প্রবাসী বাঙালি আবদুস সালাম এবং রফিকুল ইসলাম (মাতৃভাষা-প্রেমিক গোষ্ঠীর সদস্য) এ বিষয়ে ইউনেস্কোর সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করলে ১৯৯৯ সালের ৩ মার্চ ইউনেস্কো সদর দপ্তরের ভাষা বিভাগের কর্মকর্তা আন্না মারিয়া মেজলোককে রফিকুল ইসলাম একটি চিঠিতে জানান :

Regarding you request to declare the 21 February as International Mother Language Day, the idea is indeed very intersting.

অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সংস্থার একজন কর্মকর্তার কাছে এই প্রথম বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। প্রবাসী রফিকুল ইসলামকে একই বছর ৮ এপ্রিল মারিয়া উত্তর দেন :

Of course, as I also mentioned to you, the eventual adoption of the documents depends on the interest of the Board Members.

বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে উত্থাপনের সুযোগ নেই, ইউনেস্কোর পরিচালনা পরিষদের কোনো সদস্য রাষ্ট্রের মাধ্যমেই তা উত্থাপিত হতে হবে। ইউনেস্কো সদর দপ্তরের ভাষা বিভাগের কর্মকর্তা মারিয়া সম্ভবত এ বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। তিনি রফিকুল ইসলামকে ইউনেস্কো পরিচালনা পরিষদের কয়েকটি সদস্য দেশের ঠিকানা প্রেরণ করেন। এ তালিকায় বাংলাদেশ, ভারত, কানাডা, ফিনল্যান্ড এবং হাঙ্গেরির নাম ছিল। ইউনেস্কো সাধারণ পরিষদে বিষয়টি আলোচ্যসূচির আন্তর্ভুক্ত করতে হলে কয়েকটি সদস্য দেশের পক্ষে প্রস্তাব পেশ করা জরুরি ছিল এবং এজন্য সময় ছিল খুবই অল্প।

রফিকুল ইসলাম কানাডা থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে অতি দ্রুত প্রধানমন্ত্রীর অফিসে নোট পাঠানো হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাগিদ দিয়ে লেখে :

International Mother Language Day সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাব আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ তারিখের মধ্যে ইউনেস্কোর কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছুতে হবে। ... এমতাবস্থায় ... প্রস্তাবটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় বিবেচনার জন্য সার-সংক্ষেপটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে পেশ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সময় স্বল্পতার বিষয়টি উপলব্ধি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিহার করে এবং যাতে কালক্ষেপণ না হয় সেজন্য নথি অনুমোদনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ছাড়াই প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দেন সরাসরি। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে Bagladesh National Commission of UNESCO (BNCU)-র পক্ষে এর সচিব অধ্যাপক কফিলউদ্দিন আহমদের স্বাক্ষরিত ১৭ লাইনের প্রস্তাবটি প্যারিসে পৌঁছে যায়। প্রস্তাবের শেষ অংশটি ছিল :

Bangladesh Proposes that 21 February be proclaimed International Mother Language Day throughout the world to commemorate the martyrs who sacrificed their lives on this very date in 1952.

তখন ইউনেস্কোর নির্বাহী পরিষদের ১৫৭তম অধিবেশন এবং ৩০তম সাধারণ সম্মেলন চলছিল। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের বিষয়টি নিয়ে ইউনেস্কোতে দুটি প্রধান সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমত, ইউনেস্কো ভেবেছিল, এমন একটা দিবস পালন করতে গেলে ইউনেস্কোর বড় অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হবে। ফলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। একই সঙ্গে ইউনেস্কো মহাপরিচালক International Mother Language Day নয়, International Mother Tongue Day নামে একে অভিহিত করতে সচেষ্ট হন। মহাপরিচালক এজন্য এক লাখ ডলারের ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করেন এবং দু-বছর পর নির্বাহী পরিষদের ১৬০তম অধিবেশনে একটি Feasibility Study-র মাধ্যমে বিষয়টি উত্থাপনের আদেশ দেন:

The Director-General has no objection to this draft resolution. He feels, however, that it would be advisabible to prepare first a feasibility study... The feasility study could not be accommodated within the existing budget allocation... International Mother Tongue Day (N.B. not Mother Language Day) will be carried out and will be submitted to the Executive Board at its 160th Session.

এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার বিষয়টি দীর্ঘসূত্রতার জালে আটকা পড়ে। প্রস্তাবটি কার্যকর হতে কমপক্ষে দু-বছর সময় লাগবে বলে মনে করা হয়। এ সংকট থেকে উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক। সে সময় তিনি ইউনেস্কো অধিবেশনে যোগদানকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে প্যারিসে অবস্থান করছিলেন। তিনি অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায় তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য পৃথিবীর ১৮৮টি জাতির সামনে তুলে ধরেন। তিনি বিভিন্ন দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠক করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পক্ষে অভিমতও গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তিনিই উপস্থিত সদস্যদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, দিবসটি পালন করতে ইউনেস্কোর অর্থ ব্যয় হবে না এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষ নিজেরাই নিজেদের মাতৃভাষার গুরুত্ব আলোচনা ও জয়গান গাইতে-গাইতে দিবসটি পালন করবে।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার ডকুমেন্টেশন পুস্তিকায় সদস্য সচিব ড. মোহাম্মদ হাননান লিখেছিলেন :

শিক্ষামন্ত্রী এ.এস.এইচ.কে সাদেক একই সঙ্গে কতকগুলো ব্যক্তিগত কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও চালান। এক রাতে তিনি পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের নেতার সঙ্গে একটি বৈঠকের আয়োজন করেন। প্রস্তাবটিতে পাকিস্তানের সমর্থন নিশ্চিত করা খুব প্রয়োজন ছিল। কারণ যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্ন ঘিরে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সংগঠিত হয়েছিল, তাতে পাকিস্তানের মনোভাবে অবশ্যই স্পর্শকাতর প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা ছিল। এছাড়া অন্যান্য মুসলিম দেশ, বিশেষ করে সৌদি আরবের সমর্থনের ক্ষেত্রেও সে দেশের ইতিবাচক ভূমিকা প্রভাব ফেলতে পারতো। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানে সামরিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ফলে পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী সে বছর ইউনেস্কো সম্মেলনে যাননি, পাকিস্তানি দলের নেতৃত্ব দেন পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব। বৈঠকে এ.এস.এইচ. কে সাদেক আবিষ্কার করেন, পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব এক সময় তাঁর অধীনে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে কাজ করেছেন। আরো দেখা গেল, পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব বাংলায় চমৎকার কথা বলতে পারেন। এ বৈঠক এভাবে খুবই ফলপ্রদ হলো। তিনি প্রস্তাবটি সমর্থনের আশ্বাস দেন। পরদিন সকালে সৌদি শিক্ষামন্ত্রীর সম্মানে চা-চক্রের আয়োজন করা হলো। সৌদি শিক্ষামন্ত্রী বললেন, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি পরে তাঁর মতামত জানাবেন। বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী বুঝে গেলেন ১৯৫২ সালের ব্যাপারে বলে সৌদি মন্ত্রী পাকিস্তানের মতামতটা জেনে সিদ্ধান্ত দিতে চাচ্ছেন। পরে সৌদি আরব এত বেশি আগ্রহী হয়ে পড়েছিল যে, একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় বাংলাদেশের সঙ্গে তারা যৌথ প্রস্তাবকও হয়ে গেল।

ইউরোপীয় দেশগুলোকে নিয়েও কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় তাদের আপত্তি না থাকলেও তারা ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলির কাছে শিক্ষামন্ত্রী যুক্তি ও আবেগের সঙ্গে বিষয়টি তুলে ধরেন যে, পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালিরা মাতৃভাষার অধিকারের জন্য রক্ত দিয়েছে এবং সেটা ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে। পয়লা মে দিনটি যেমন শিকাগোর ঘটনার দ্বারা অভিষিক্ত, তেমনি একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাও সমভাবে তাৎপর্যময়। তখন ইউরোপীয়রা ব্যাপারটা বুঝতে সক্ষম হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ পাপুয়া নিউগিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রস্তাব পেয়ে উপলব্ধি করে, তাদের দেশের বিভিন্ন গোত্র ও জাতিসত্তার শত-শত এবং আলাদা আলাদা মাতৃভাষা রয়েছে, যার অনেকগুলিই বিলুপ্ত হতে চলেছে। তারাও একুশে ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাবে উৎসাহী হয়ে সমর্থক-সদস্য হতে চায়।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার এই 'প্রাথমিক পদক্ষেপ' সম্পন্ন করে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক ৪ নভেম্বর ১৯৯৯ দেশে ফেরেন।

এভাবে দীর্ঘ প্রক্রিয়া পার হওয়ার পর ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারি লাভ করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা। ইউনেস্কোর ঐতিহাসিক সেই অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের মূল প্রস্তাবক ছিল বাংলাদেশ এবং সৌদি আরব। আর সমর্থন করেছিল–আইভরিকোস্ট, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কমোরোস, ডোমিনিকান রিপাবলিক, পাকিস্তান, ওমান, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপিন, বাহামাস, বেনিন, বেলারুশ, গাম্বিয়া, ভারত, ভানুয়াতু, মাইক্রোনেসিয়া, রুশ ফেডারেশন, লিথুয়ানিয়া, মিশর, শ্রীলঙ্কা, সিরিয়া ও হন্ডুরাস।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্বোধন উপলক্ষে জাতিসঙ্ঘ মহাসচিবের বাণী

UNITED NATIONS
THE SECRETARY-GENERAL

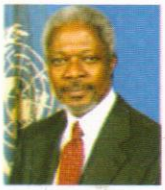

MESSAGE
ON
INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY
21 FEBRUARY, 2000

I am delighted to convey my greetings, on the occasion of the launch of the first International Mother Language day. This day will help to raise awareness among all peoples of the distina and enduring values of their languages. In an age of globalization and international cooperation where a few languages have become global languages, it is imperative that we uphold the diversity of local languages.

Along with nation and community, language is all essential component of identity and means by which we find our place in the world. The very essence of belonging in an increasingly rootless world is to hear a language of one own, to understand and be understood with ease. While differing languages have in the past separated peoples and groups, it is my hope that all people can unite in celebrating the full diversity of languages.

The United Nations and UNESCO have long worked to promote the dissemination of mother tongues and to advanced multi-lingual education and linguistic diversity, given the danger that many of the 6000 languages spoken today may disappear in the next 20 years, it is critical that the international community redouble its efforts to protect this common heritage of mankind.

Above all, the lesson of our age is that languages are not mutually exclusive, but that human beings and humanity are enriched by communicating in more than one language. Languages no less than the people to whom they belong can and must coexist in one new century, and it is my hope that International Mother Language Day will contribute to this noble aim.

Kofi Annan

ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

306/DR.35 [submitted by Bangladesh and Saudi Arabia; supported by Oman, Benin, Sri Lanka, Egypt, the Russian Federation, Bahamas, Dominican Republic, Belarus, the Philippines, Cote d'Ivoire, India, Honduras, Gambia, the Federated States of Micronesia, Vanuatu, Indonesia, Papua New Guinea, Comoros, Pakistan, Islamic Republic of Iran, Lithuania, Italy and the Syrian Arab Republic] relating to paragraph 05204, the Commission recommends that the General Conference proclaim `International Mother Language Day' to be observed on 21 February.

30C/DR.page 2
Keeping in mind also that all moves to promote the dissemination of mother tongues will serve not only to encourage linguistic diversity and multilingual education but also to development of fuller awareness of linguistic and cultural traditions throughout the world and to inspire solidarity based on understanding, tolerance and dialogue.

Considering consequently that one of the most effective ways to promote and develop mother tongue is the establishment of an `International Mother Language Day' with a view to organising various activities in the Member States and an Exhibition at UNESCO Headquarters on that same day.

Recognizing the unprecented sacrifice made by Bangladesh for the cause of mother language on 21 February 1952.

Noting that this idea has not yet been adopted at the International level, propose that 21 February `International Mother Language Day' throughout the world to commemorate the martyrs who sacrificed their lives on this very date in 1952.

উদ্বোধনী-অনুষ্ঠান ২০১১

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৯৯ সনের ১৭ নভেম্বর অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হলে বাংলাদেশের ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব আনন্দের সৃষ্টি হয়। এ অর্জনে সকলেই উজ্জীবিত হয় ও গৌরব বোধ করে। তৎকালীন সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ৭ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় ঘোষণা করেন যে, 'পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণা করার জন্য' ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। সে অনুযায়ী তিনি ১৫ মার্চ ২০০১ ঢাকার ১/ক সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি এ আনান।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট নির্মাণ (১ম পর্যায়)

ইনস্টিটিউট ভবণ নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং তা ৮ আগস্ট ২০০০ তারিখে একনেকের অনুমোদন লাভ করে। ভূমি অধিগ্রহণ, নকশা মূল্যায়ন ও অনুমোদন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ নানা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণের (১ম পর্যায়) কাজ শুরু হয় ৬ এপ্রিল ২০০৩। এ পর্যায়ে লক্ষ্য ছিল ১২-তলা ভিতের উপর ৫ তলা নির্মাণ করা। এজন্য বরাদ্দ হয় ১৯ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। সে-অনুযায়ী কাজ শুরু হয়। কিন্তু ০১ অকটোবর ২০০৩ তারিখে অকস্মাৎ নির্মাণ কাজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর ডিপিপি সংশোধন ও প্রকল্প ব্যয় ২১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা নির্ধারণ করে ৩ তলা পর্যন্ত নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর কাজ শুরু হয় ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ এ তা শেষ হয় ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ নবনির্মিত ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন (২০১০) মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাস (১২ অকটোবর, ২০১০) হয়েছে। এ আইন অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক। আইনের বিধান অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইনস্টিটিউট ভবনের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ১৮ অকটোবর ২০১১ তারিখে একনেক-এর অনুমোদন লাভ করে। এ জন্য প্রকল্প-ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। এ পর্যায়ে ইনস্টিটিউটের পরবর্তী অডিটোরিয়ামের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা ছাড়াও ইনস্টিটিউট ভবনের ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা নির্মিত হবে। উল্লেখ্য যে, ৪র্থ তলায় সকল আধুনিক সুবিধাসহ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, উন্নত মানের রেস্ট হাউস, পরিচালক ও উপপরিচালকবৃন্দ অফিস কক্ষ; ৫ম তলায় আন্তর্জাতিক মানের গ্রন্থাগার, ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব ও ভাষাপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আইটি ল্যাব, রিচার্স সেল, শিক্ষকদের কক্ষ ও শ্রেণিকক্ষ এবং ৬ষ্ঠ তলায় বিশ্বের সকল মাতৃভাষার তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য ল্যাংগুয়েজ আর্কাইভ নির্মাণ, উপদেষ্টা-অফিসসহ সকল নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও ইনস্টিটিউটটের নিজস্ব ওয়েবসাইট নির্মাণ এবং বর্তমানে দ্বিতীয় তলার স্থাপিত ভাষাজাদুঘরকে আরো সমৃদ্ধ করা হবে। ইতিমধ্যে নির্মাণ কাজের পরামর্শক নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে এবং আশা করা যাবে বর্তমান অর্থ বছরেই পুরোপুরি কাজ শুরু করা যাবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আইন

গত ১২ অকটোবর ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট আইন (২০১০) পাস হয়েছে। এ আইনের ৩-এর উপধারা (১) অনুযায়ী সরকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন (দ্র. বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, জানুয়ারি ২৭, ২০০১)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. দেশে ও দেশের বাইরে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
২. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, এতদসংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;
৩. বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা–আন্দোলন বিষয়ে গবেষণা ও ইউনেস্কোর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে এ সংক্রান্ত ইতিহাস প্রচার;
৪. বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
৫. বাংলা ভাষার উন্নয়নে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা;
৬. ভাষা ও তথ্য–প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ;
৭. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন;
৮. ভাষা–আন্দোলনের স্মৃতি সংরক্ষণ;
৯. বিভিন্ন ভাষা বিষয়ে অভিধান বা কোষগ্রন্থ প্রকাশ এবং হালনাগাদকরণ;
১০. পৃথিবীর সকল ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষার লেখ্যরূপ প্রবর্তন;
১১. বাংলাসহ পৃথিবীর সকল ভাষার বিবর্তন বিষয়ক গবেষণা;
১২. ভাষা বিষয়ে গবেষণা–জার্নাল প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন;
১৩. ভাষা বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশি ও বিদেশিদের ফেলোশিপ প্রদান;
১৪. ভাষা ও ভাষা বিষয়ক গবেষণায় অবদানের জন্য দেশি ও বিদেশিদের পদক ও সম্মাননা প্রদান;
১৫. ভাষা বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান;
১৬. ভাষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক ভাষা প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও রক্ষা;

১৭. সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো রাষ্ট্র, দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর;
১৮. বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণমালার জন্য একটি আর্কাইভ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনা;
১৯. ভাষা বিষয়ে একটি জাদুঘর নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনা;
২০. আন্তর্জাতিক মানের লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা;
২১. ভাষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়া চ্যানেল স্থাপন;
২২. পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস, নমুনা ও তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন;

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ভাষা ইনস্টিটিউট ভবন ও ভাষা জাদুঘর উদ্বোধন

মননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর উদ্বোধন করেছন।

জনবল কাঠামো

ইনস্টিটিউটের জনবল কাঠামোতে ৪৪টি ক্যাটেগরির ৯১টি পদ সৃজনের সরকারি সম্মতি (৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২)পাওয়া গেছে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে একজন মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে একজন পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) ও একজন উপ-পরিচালককে ইনস্টিটিউটে যথাক্রমে সংযুক্তি ও প্রেশন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) প্রকল্পের ৫ কর্মচারী (এক জন কম্পিউটার অপারেটর, একজন হিসাব সহকারী, একজন গাড়িচালক ও দু-জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী)-কে ইনস্টিটিউটে স্থানান্তর করা হয়েছে।

কর্ম-পরিকল্পনা

ইনস্টিটিউট বেশ কিছু কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. বাংলাদেশের নৃভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা (Ethnolinguistic Survey of Bangaldesh) সম্পাদন করা;
২. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
৩. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পত্রিকা *মাতৃভাষা* প্রকাশ করা;
৪. ভাষাজাদুঘরের তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ করা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;
৫. ইনস্টিটিউটের গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণের পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধি বৃদ্ধি ও পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য দেশের ও দেশের বাইরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ, ভাষা ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্র, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা।

আমার ভাইয়ের রক্তে রঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

কবির নিজ হাতে লেখা

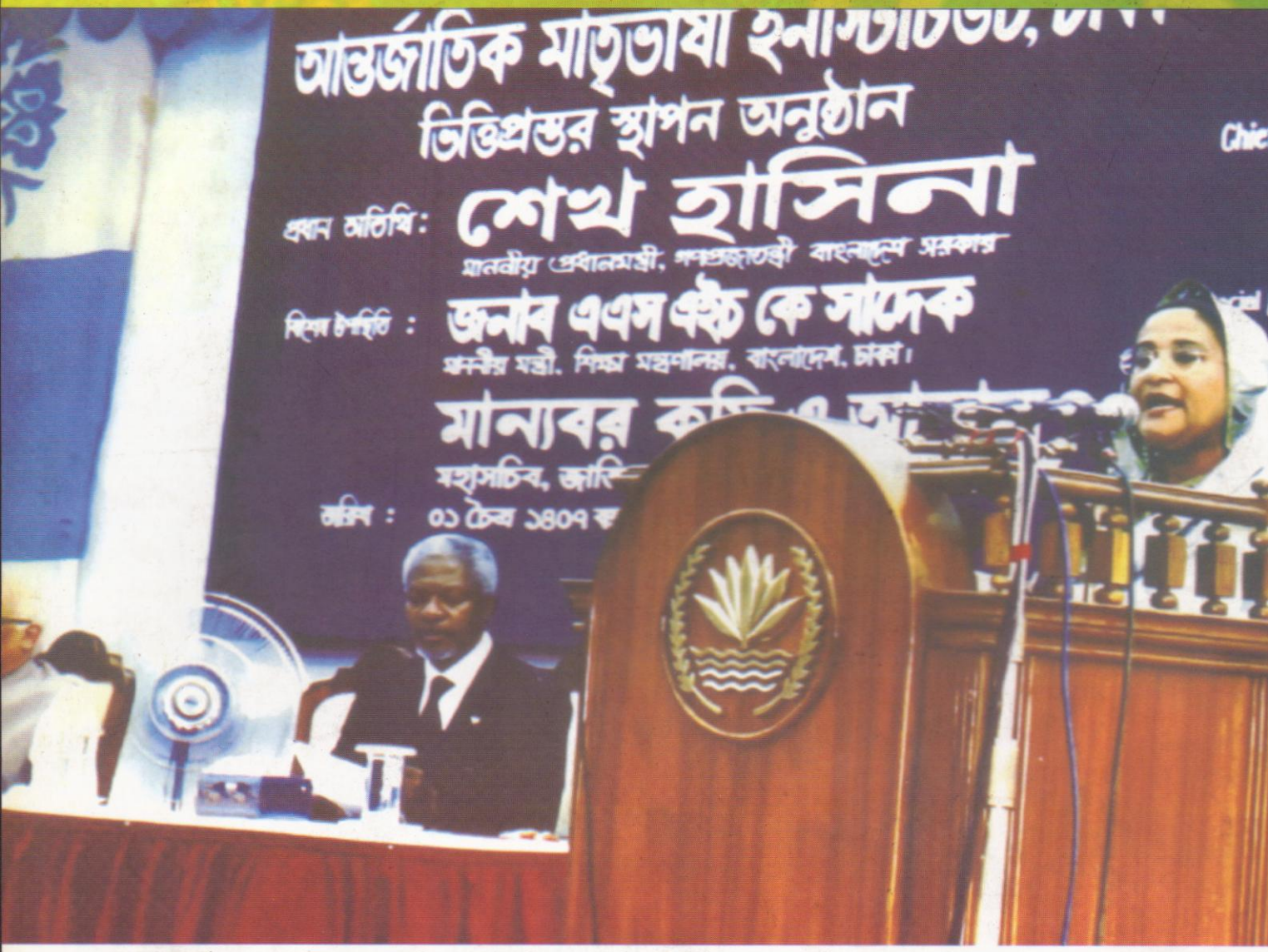

১৫ মার্চ ২০০১ : জাতিসংঘের মহাসচিব মান্যবর কফি এ আনান-এর উপস্থিতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন